শেষের অশ্রু

দাঊদ ইবনু সুলাইমান উবাইদি

“আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি : শয়তান তোমার কাছে বিভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকবে। তবে প্রধানত নারীর মাধ্যমে ঢুকবে। তুমি তার থেকে দায়েমি যিকর—দৃষ্টি সংযত করা ও কুরআন তিলাওয়াত করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

নিজেকে মনে করিয়ে দাও, এই সুন্দরী মেয়ের চেহারা কিছুদিন পর একটা মৃতদেহে পরিণত হবে; যে দেহ কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলবে। আর জান্নাতে এমন হূর আছে, যাদেরকে উদীয়মান সূর্য দেখলেও লজ্জা পায়।”

শেষের অশ্রু

লেখক

দাঊদ ইবনু সুলাইমান উবাইদি

অনুবাদক

আব্দুল্লাহ মজুমদার

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্যে। যাকে তিনি পথ দেখান, তাকে কেউই পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট অবস্থায় ছেড়ে দেন, তাকে কেউই পথ দেখাতে পারে না। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর।

আল্লাহর অশেষ করুণা ও মেহেরবানিতে প্রকাশিত হলো *শেষের অশ্রু* বইটি। এটি মূলত দাঊদ ইবনু সুলাইমান উবাইদি-র *حديث الشيخ* বইয়ের মূল আরবি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। বইটিতে রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য বার্তা। যে বার্তা তাদের পথ চলাকে সুগম করবে, এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে এবং জীবনের বড়সড় বাঁকে কীভাবে মোড় নিতে হয়, সে দীক্ষা দেবে।

দুটি কারণে বইটি অনুবাদ করার জন্যে আমি আগ্রহী হয়েছিলাম—

প্রথমত, ফিতনার যুগে বসবাস করছি আমরা। চারিদিক থেকে ফিতনার অবিরত আক্রমণ পর্যদুস্ত করে দিচ্ছে আমাদের। যে পরিবেশে আমরা বসবাস করি, সেখানে ফ্রি-মিক্সিং স্বাভাবিক ব্যাপারে রূপ নিয়েছে। ফলে নিজের অজান্তেই অনেক সময় ফিতনায় পড়ে যেতে হয়। দ্বীনি ব্যাপারে গাফলতি ঘিরে ধরলে ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশা স্বাভাবিক মনে হয়। ছেলে-মেয়ের এই পারস্পরিক পরিচিতি এক সময় রূপ নেয় প্রেমে। প্রেম-ভালোবাসার এ জালে ধরা পড়লে দ্বীন-দুনিয়া সবই হারাতে

হয় একজন মানুষকে। সে বিষয়টির প্রতি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করতে পারে বইটি।

দ্বিতীয়ত, জীবন চলার পথে বারংবার পাপ-কাজে জড়িয়ে হোঁচট খাই আমরা। কখনও হতাশায় থমকে দাঁড়াই, কখনও-বা আশা বুকে বেঁধে আল্লাহর পথে ফিরে আসার চেষ্টা করি। আমাদের উত্থান-পতনের ধারা চলতে থাকে। কখনও যদি আমরা গভীরতর গহ্বরে পতিত হয়ে যাই, তা হলে আমরা পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়ি। মনে হয়, আর বুঝি ফিরে আসার উপায় নেই। কিন্তু জীবনের আঙিনায় পতন-ই শেষ না। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকলেও ফিরে আসার একটা পথ আছে, তা হলো তাওবাহ করা। এ রকমই একটি ঘটনা আছে বইটিতে। কীভাবে পথ হারিয়ে ফেললেও ফিরে আসতে হয়, সুপথ বেছে নিতে হয় তার প্রেরণা জোগাবে এ বই।

শেষের অশ্রু পড়ার সময় সবাই আরেকটি দিক মন দিয়ে চিন্তা করবেন বলে আশা রাখি। সেটা হচ্ছে যতই দ্বীনদার বলে নিজেদের দাবি করি না কেন, আমরা কেউই ফিতনার ঊর্ধ্বে নই। একটু অসতর্কতা, চোরা-দৃষ্টি, সামান্য কথা কিংবা ভুল জায়গায় ভুল সময়ে থাকার ফলে নিজেদের এমন অবস্থায় আবিষ্কার করা খুবই সম্ভব, যেটা হয়তো শুরুতে আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারতাম না। তাই উচিত যথাসম্ভব এ ধরনের ফিতনা থেকে গা-বাঁচিয়ে চলা। উচিত সব সময় আল্লাহর কাছে এসব ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়া। তিনিই তো আমাদের আশ্রয়স্থল।

পরিশেষে পাঠকবৃন্দের কাছে দুআ চাইব, যাতে আল্লাহ আমাকে ও তাদের এরূপ পাপাচারে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন, আমাদের সঠিক পথে আমৃত্যু অবিচল থাকার তৌফিক দান করেন। ধন্যবাদ জানাব প্রিয় শিহাব আহমদ তুহিন ভাইকে, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বইটিকে মানসম্মত করার পেছনে ভূমিকা রেখেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাব সমর্পণ প্রকাশনকে, এ বইটি ছাপানোর ব্যাপারে আগ্রহী হওয়াতে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

বিনীত,
আব্দুল্লাহ মজুমদার
বিজয়-৭১ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক নজরে

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম

বাগদাদের অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু হাসান মাউসিলি। আমরা গল্পটা শুনব তার মুখ থেকেই :

আমার বন্ধু ইবনু সাদিক ইবনু আবদ্ রাব্বাহ বাগদাদি। সে নিজ প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হওয়া এক যুবক। আখিরাতকে ভুলে গিয়ে সে মেতে আছে দুনিয়ার মোহে। লাভের ব্যবসা ছেড়ে যোগ দিয়েছে ক্ষতির ব্যবসায়। আর সরল-সঠিক পথ ছেড়ে বেছে নিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত গাফেলদের পথ।

আগে কিন্তু ইয়াসারের এ অবস্থা ছিল না। সত্যি বলতে কী, ওর কোনো বন্ধুই ভাবেনি, কখনও সে এমন হয়ে যাবে। কারণ, সে বড় হয়েছে আল্লাহর আনুগত্যে। আল্লাহকে ভয় করার কারণে সবাই ওর কথা জানত। তাকে এক নামে চিনত। এমনকি তার বন্ধুদের কাছে সে পরিচিত ছিল 'আল্লাহওয়ালা' বলে । কেউ কেউ তাকে বলত 'মাসজিদের কবুতর'। কেন?

সেটার উত্তর শাইখ আবুল ইরফান আমাদেরকে জানিয়েছেন।

সুবহানাল্লাহ! কত দ্রুত মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়। মুমিনের অন্তর কত দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে! আহা! এই ছেলের তাকওয়ার কারণে আমি ওকে ঈর্ষা করতাম। সে কৈশোর থেকেই ভালো কাজ করার তৌফিক লাভ করেছিল। ছোটোবেলা থেকেই সালাফদের বইপত্র পড়েছে। জ্ঞানে ও ধার্মিকতায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল সবাইকে। হাসান

বসরি, মালেক ইবনু দীনার, ত্বাউস, হাবীব আজমি রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ সকলের বই-ই তার পড়া ছিল। একদিন ইয়াসার আবুল হামেদ গাযালির 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' পড়ে বলেছিল, 'যে ব্যক্তি এই বই পড়েনি সে তো (জীবিত থাকলেও তার অন্তর) মৃত!'

তার বন্ধু আবুল হাসান বলেছে, 'আবদুর রহমান আল-ক্বাস্ পূর্ববর্তী যুগের মানুষের মাঝে যেমন এগিয়ে ছিলেন, তেমনিভাবে ইয়াসারও পরবর্তী যুগের মানুষদের মধ্যে এগিয়ে থাকবে।'

সে কথা বলত খুবই কম। বেশিরভাগ সময়ই চুপ থাকত। আর বললেও ফিসফিস করে কথা বলত। তবে তার প্রতিটি কথাই ছিল অন্তরভেদী, মর্মস্পর্শী। মুখ দিয়ে যেন মধু ঝরে পড়ত। যে-ই সে কথা শুনত, তার মনই সে কেড়ে নিত। তাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর বিজয়ী হতো। তার বক্তব্য শুনলে শ্রোতা বুঝতেই পারত না—তাকে কীসে জাদু করেছে! বক্তা, নাকি তার বক্তব্য?

ইয়াসার তার বক্তব্য দিয়ে জাদু করেছিল এক পারসি মেয়েকেও। তার বাড়ি ছিল বাজারে রুটির দোকানের পেছনে। বিখ্যাত লেখক আবুল হাসান আল-ওয়ার্‌রাককে কে না চিনে? তিনি থাকতেন সে বাড়ির কাছেই। ইয়াসার মেয়েটাকে বশ করেছিল তার কথার জাদু দিয়ে। অন্যদিকে সেই মেয়েও তাকে বশ করে ফেলেছিল মায়াকাড়া রূপ আর জাদুকরী কণ্ঠস্বর দিয়ে। একসময় মেয়ের বাড়িতে বাড়তে থাকে ইয়াসারের আনাগোনা। সে ওই মেয়ের মন জয় করে নেয়। এমনকি এক পর্যায়ে তারা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলে। অবশেষে তাদের অবস্থা এমন হলো যে, তারা একে অপরকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারত না।

ইয়াসার নিজ প্রবৃত্তিকে সব সময় দমন করে রাখত। কখনও হারাম কাজ করত না; এমনকি যুবকরা যখন বিভিন্ন মজলিসে গান-বাজনা শুনতে শুনতে মদ পান করত, তখন সে তাদের কাছে গেলেও মদ পান করত না।

আমার ভাবতে অবাক লাগে! কীভাবে এই পারসি মেয়ে তাকে জাদু করল? তার মন কেড়ে নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দিলো?

কিন্তু ইয়াসারকে কি খুব একটা দোষ দেওয়া যায়? মনে হয় না। কারণ হিসেবে আবুল ইরফানের ঘটনা উল্লেখ করা যাক। যে ব্যক্তিই ওই মেয়েকে দেখে আসক্ত হয়ে পড়ত, তাকেই তিনি তিরস্কার করতেন। কিন্তু ওই মেয়ে কয়েকদিন তার দোকানে আসা-যাওয়া করতেই তিনি নিজে তার নামে কবিতা লিখে ফেললেন। কবিতার

নাম—'ভালোবেসে ফেলেছি'। তিনি এত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, তারপরেও ওই মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। শুধু তাই না, তার নামে কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন।

আমরা তাই আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই। তিনি ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি নেই। আর আল্লাহর কাছে নারীদের ফিতনা থেকে পানাহ চাই। আসলেই নারীদের ফিতনা খুবই ভয়ানক। যাই হোক, আবার ফিরে যাই মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকমাউসিলি-র কাছে। তিনি বলেছেন,

পরবর্তীকালে আমি দ্বীনদার ও বিবেকবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি ইয়সারের বিস্তারিত ঘটনা। ঘটনা কীভাবে শুরু হয়েছিল, আমাদের সাথি ইয়াসার কীভাবে হেঁটেছিল ভুল পথে—এভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবই জেনেছি। এটা আসলেই সত্য ঘটনা। যদি মানুষ এই ঘটনা জানে, তবে এটা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে।

শুরুতে আমি ঘটনার বর্ণনাকারী শাইখদের নাম উল্লেখ করব।

প্রথমত, শাইখ আবুল হাসান আল-ওয়ার্‌রাক; যিনি বেশ কয়েকটি বই রচনার কারণে বিখ্যাত। আলাদা করে তাকে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

দ্বিতীয়ত, শাইখ আবুল ইরফান ইবনু আলি; তিনি কবিতা, ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার জন্য বিখ্যাত। দেখতে মধ্যম গড়নের আর বেশ স্বাস্থ্যবান। তার কথায় সব সময় নতুনত্ব ও রসিকতার ছোঁয়া থাকে। এ কারণে শ্রোতাদের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয়।

তৃতীয়ত, শাইখ জাওয়াদ ইবনু জাফর ইবনু হাসান। যাকে বলা যায় বাগদাদের চিত্রশিল্পীদের সর্দার। আমি অনেকের কাছেই শুনেছি, তিনি নাকি আল-মাদরাসাতুল মুস্তানসিরিয়্যাহ-এর নদী তীরের ছবি দেখেই এঁকে ফেলেছিলেন। যদিও তিনি ছবিটা শেষ করতে পারেননি, তবুও তা অসাধারণ হয়েছিল।

এদের থেকেই আমি এ ঘটনাগুলো বর্ণনা করছি। সংক্ষিপ্ত করার জন্য সবার নাম উল্লেখ করলাম না। আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই, তিনি সকল মর্যাদা ও ফযলের অধিকারী। দিনে ও রাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্যই।

সাতটি তালা

বাগদাদের অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মাউসিলি বলেন,

আবুল হাসান আল-ওয়ার্‌রাক আমাদের সাথি ইয়াসারকে আলাদা চোখে দেখতেন। তাকে তাকওয়া ও দ্বীনদারি-র উৎকৃষ্ট উদাহরণ মনে করতেন। এমনকি তিনি মনে করতেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ যে সাত শ্রেণীর লোককে তাঁর আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন, তাদের মধ্যে ইয়াসারও থাকবে।

কিন্তু যখন এ ঘটনা ঘটল এবং ধাপে ধাপে ইয়াসারের অধঃপতন হলো তখন আবুল হাসান অনেক দুঃখ পেলেন। তিনি এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতে আঘাত করতে করতে বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ... এ তো বড় ধরনের বিপদ! আমি তো ভেবেছিলাম ইবলিস কখনোই তার কাছে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু এই মেয়ে!!'

ওই পারসি মেয়ে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। পাশাপাশি বিভিন্ন শাস্ত্রে তার ছিল সুগভীর পাণ্ডিত্য। আরবি ভাষাকে অনারব স্বরে উচ্চারণ করার ফলে তার কথাগুলোর মধ্যে ছিল অন্যরকম একটা সৌন্দর্য। এটা দিয়ে সে সহজেই কেড়ে নিতে পারত মানুষের মন।

আবুল হাসান আল-ওয়ার্‌রাক শপথ করে বলেন, তিনি কখনও ওই মেয়েকে নিজ চোখে দেখেননি। এমনকি তার দিকে চোখ তুলেও তাকাননি; যদিও তার বাড়ি আবুল হাসানের বাড়ির কাছেই। কারণ হিসেবে তিনি বলেন,

একবার তাকানোই অন্তরে হাজার বার আফসোসের কারণ হয়ে যায়।

তিনি ওই আয়াতটা মেনে চলেন :

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

"আপনি মুমিনদের বলে দিন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।" (সূরা নূর : ৩০)

ঘটনার শুরুটা জানিয়েছেন শাইখ আবূ মুহাম্মাদ আল-মুয়াইয়িদ বিল্লাহ।

গল্পের শুরু ওই মেয়ের বাড়িতে। প্রতি মঙ্গলবার বিকেলে সেখানে বসত গান-বাজনা ও খেলাধুলার আসর। সে এলাকার যুবকরা সব সময় আসত ওই আসরে। তাদের মধ্যে ছিল আবূ মাহমূদ হাকীম ইবনু মাহমূদ, হাস্‌সান ইবনু মুয়াইকীব, হাবীব ইবনু মাসঊদ আল-জাস্‌সাস-সহ আরও অনেকেই, যাদের নাম শাইখ উল্লেখ করেননি।

সেদিন সাঈদ ইবনু মনসূর যথাসময়ে এল না। শাইখ আবুল ইরফানের বাড়ির বিপরীতেই তার বাড়ি। সে দেরি করে পৌঁছলে সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ছিলে?

তার চেহারাটা বেশ ফ্যাকাশে। সে জামাকাপড় ঠিক করতে করতে বলল, ইয়াসারের সাথে দেখা হয়েছিল...।

এ কথা শুনে সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। চুপ হয়ে গেল উপস্থিত সকলে। কেবল ওই মেয়েই তার সুন্দর দুটি চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়াসারটা কে?'

ইয়াসারের পুরাতন বন্ধু হাবীব ইবনু মাসঊদ বলল, 'ওর সম্পর্কে আমি সবচেয়ে ভালো জানি।'

এরপর সে তার সম্পর্কে বিস্তারিত বলে যেতে লাগল। তার জ্ঞান-দুনিয়াবিমুখতা-বিনয়-সচ্চরিত্র-কথাবার্তা-সহ সবকিছুই বলে গেল।

দম নেওয়ার জন্য একটু থেমে আবার বলা শুরু করল, তার দিকে একবার তাকালেই দুনিয়াবিমুখদের জীবনী পড়া হয়ে যায়। তাদের জীবনীর বইগুলোতে যা-কিছু লেখা আছে, তার সবই এই একটা ছেলের মধ্যে আছে।

হাস্‌সান ইবনু মুয়াইকীব বলল, 'এই লোকটা চিনে নিয়েছে নিজের রবের পথ...।'

ওই মেয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনেছিল আর অন্তরে গেঁথে

নিয়েছিল। তখনই সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল—যেভাবেই হোক, এই ছেলেকে বাগে আনতে হবে। এই শিকার তার চাই-ই চাই...।

মেয়েটার বসার ঘরে ঢুকলেই উন্নত রুচির ছাপ পাওয়া যায়। ঘরের মেঝেটা সুনিপুণ কারুকার্যমণ্ডিত কার্পেটে আবৃত। জানালাগুলোতে ঝুলছিল সবুজ রঙের পর্দা, যা থেকে বের হয়ে এসেছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের দড়ি। ঘরটাকে আলোকিত করে রেখেছিল ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা নানা রঙের বাতিগুলো। ঘরের প্রান্তে থাকা আম্বরদানিগুলো থেকে পাওয়া যাচ্ছিল মিস্‌কের মন-মাতানো সুঘ্রাণ।

মেয়েটি তার মাথা কিছুটা হেলিয়ে হাবীব ইবনু মাসঊদকে জিজ্ঞাসা করল, সে কি বিবাহিত?

আবূ মাহমূদ তাদের মধ্যে সবচেয়ে রসিক ছেলে। তুর্কি-সহ আরও কয়েকটি ভাষায় বেশ দক্ষ। সে শার্লম্যানের দেশ ঘুরে এসেছে। সেখানকার অভিজ্ঞতার আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়ে সে সব সময় মাতিয়ে রাখত আসরটাকে।

আবূ মাহমূদ বুঝতে পারল মেয়ের মনের কথা। সে হাসতে হাসতে বলল, 'বৃথা স্বপ্ন দেখা বাদ দাও, বুঝলে? ইয়াসারের দিকে যাওয়ার কোনো রাস্তাই নেই তোমার। ভুলে যাও আর নিজ কাজে মন দাও।'

মেয়েটা চ্যালেঞ্জ লুফে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বলল, 'তুমি দেখে রাখো... ।'

বলেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। তারপর আনমনে কী যেন ভেবে আবার বলল, 'আমি যদি তাকে এখানে আনতে পারি, তা হলে?'

আবূ মাহমূদ হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে গেল। সে এক হাজার দীনার বের করে তা টেবিলে ছুড়ে দিয়ে সাহস যোগানোর জন্য বলল, 'যদি তুমি পারো, তা হলে এই সব দীনার তোমার।'

এসব দেখে আর চুপ থাকতে পারল না হাবীব ইবনু মাসঊদ। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আর এই লোকটাকে তার জগতেই থাকতে দাও।'

আবূ মাহমূদ তার কথায় কোনো পাত্তা না দিয়ে হাসতে হাসতে বলতে লাগল, 'সে এখানে আসবে.. আমি নিজ হাতে তাকে মদ পান করাব।'

মেয়েটা অন্যমনস্কভাবে তার কানের মুক্তার দুলটা স্পর্শ করল। তারপর ডাক দিলো তার এক দাসকে। হাজির হলো কৃষ্ণকায় এক দাস। দাসের হাতে গুজে দিলো এক

টুকরো কাগজ। কিছু একটা সে কাগজে লিখে সাবধানে তা ভাজ করে ঢুকাল সুগন্ধি-রুমালে। তারপর সাঈদ ইবনু মানসুরকে লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়াসারকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

সে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'তাকে দেখলাম এশার সালাত আদায় করে কাজি সাহেবের বাড়িতে গিয়েছে।'

হাবীব ইবনু মাসঊদ এ পর্যায়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত থেকে চিরকুট কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, তুমি এ কাজ কোরো না।'

কিন্তু মেয়েটা বাম হাত দিয়ে হাবীবের হাত সরিয়ে দিলো। তারপর তার দাসের কানে কিছু কথা বলে তাকে ওই চিরকুট দিলো। সে বের হওয়ার আগে হাবীব ইবনু মাসঊদ চিৎকার করে বলল, 'মনে রেখো, ইয়াসারের কাছে পৌঁছতে হলে সাতটা দরজা পার হতে হবে। আর প্রতিটা দরজায় একটি একটি করে মোট সাতটি লোহার তালা লাগানো আছে।'

এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই দাস ফিরে এসেছিল। দাসের মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। সে কোনো কথা না বলে শুধু হাত থেকে চিরকুটটা মেয়েকে দিলো। মেয়ে চিরকুটটাতে একবার নজর বুলিয়েই তার সাদা পোশাক ও ঘন কালো চুল ঠিক করতে করতে লাফিয়ে উঠে বলল, 'এই তো, প্রথম তালা খুলে গেছে!'

বিস্ময়ে হাবীবের মুখটা হা হয়ে গেল। সাঈদ ইবনু মানসুর তো বিশ্বাসই করতে পারল না তার দুই কানকে। হাস্‌সান এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েই রইল। তবে কেবল আবূ মাহমূদ হাত তালি দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আমি বলেছি না! নিজ হাতে তাকে মদ পান করাব।'

মেয়েটা প্রজাপতির মতো ঘরের ভেতর চক্কর দিয়ে বলতে লাগল, 'এই তো প্রথম তালা খুলে গেছে। তোমরা সবাই দেখো।'

সে চিরকুটটা টেবিলের ওপর রাখল। উপস্থিত সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল এর ভেতরের লেখা পড়ার জন্য।

বিস্ময়কর চাবি

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মাউসিলি বলে চললেন,

সর্বপ্রথম ওই চিরকুটটা হাতে নিল আবূ মাহমূদ। চিরকুটটি হাতে নিয়ে সে হাবীব ইবনু মাসঊদের দিকে ইঙ্গিত করে হাসতে হাসতে বলল, 'কী দেখলে! তোমার বন্ধু ঠিকই ফাঁদে পা দিয়েছে।'

কিন্তু সে ওই চিরকুট পড়ার আগেই মেয়ে তার হাত থেকে চিরকুটটা কেড়ে নিয়ে দাস ইরবীদকে ধরে নিজ রুমে ঢুকে গেল।

মেয়ে তার দাসকে বলল, 'ইরবীদ, তুমি যা-কিছু দেখেছ, তার সবই খুলে বলো।'

ইরবীদ তার দিকে তাকাল। দৃষ্টি ভাবলেশহীন। তার চেহারার ভঙ্গি পরিবর্তিত। এদিকে মেয়েটা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তার কথা শোনার জন্য। মেয়েটা তাকে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'ইরবীদ, কী হলো তোমার? কথা বলছ না কেন?'

ইরবীদ তার মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'আপনি কি আসলেই এটা করতে চান?'

খুব আগ্রহের সাথে মেয়েটা জবাব দিলো, 'এক হাজার দীনার পাব ইরবীদ। এ-ক হা-জা-র!'

ইরবীদ মাথা ঝাঁকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, আমার মনে হয় না আপনি শুধু দীনারের লোভে এটা করছেন।'

মেয়ে ভ্রূ কুঁচকে তার সুন্দর চাহনি ইরবীদের চেহারায় নিবদ্ধ করে বলল, 'তোমার

কী মনে হয় ইরবীদ?'

ইবরীদ এক ধাপ পিছিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বাতির আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তার চেহারার রঙ। সে হাত দিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'জানি না, কিন্তু...'

মেয়েটা তার পা দিয়ে সজোরে আঘাত করল মাটিতে। উন্মত্ত ক্রোধে তখন লাল হয়ে গেছে তার দুই গাল। সে বলে উঠল, 'কিন্তু কী?'

ইরবীদ শান্ত গলায় জবাব দিলো, 'ইয়াসারের কাছে পৌঁছনোর থেকে চাঁদের কাছে এক হাজার বার পৌঁছনো উত্তম। মনে রাখবেন, আমি এই দুই চোখ দিয়ে তার মতো দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি আর দেখিনি। এদিকেও না, ওদিকেও না।'

এ কথা বলে সে পূর্বদিকে হাত দিয়ে ইশারা করল। পূর্বদিকে ফিরে সে দিকেই মূর্তির মতো চেয়ে রইল। মেয়েটি নিচু করে ফেলল তার মাথা। তার চেহারার রঙ পাল্টে গেছে। খুব কষ্ট করে কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, 'আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি ইরবীদ। সেই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ো না।'

এরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমাদের টাকাপয়সার খুব দরকার।'

ইরবীদ তার হাত নামিয়ে দাঁড়াল আগের মতো। সে অনুভব করল, মনিবের কথা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। মেয়েটিও মুচকি হাসি দিয়ে তার দিকে তাকাল কোমল দৃষ্টিতে। বাতির আলোতে জ্বলজ্বল করতে লাগল তার দুই চোখ। কোমল ও নম্র গলায় শান্ত স্বরে সে বলল, 'এখন তা হলে বলো ইরবীদ। সবকিছু খুলে বলো। যা-কিছু দেখেছ আর যা-কিছু শুনেছ—কিছুই বাদ দেবে না।'

ইরবীদ বলতে শুরু করল, 'আমি ওখানে গিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ-এর খাদেম নাযিল আর-রূমীকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখলাম। তাকে থামিয়ে বললাম, আমি একাকী ইয়াসারের সাথে দেখা করতে চাই। সে আমাকে মূল কক্ষের পাশে এক কক্ষে নিয়ে অপেক্ষায় রাখল। একটু পরেই ইয়াসার এল। ইয়াসার মধ্যম গড়নের, চেহারাটা গোলাপি বর্ণের, মুখ থেকে যেন নূরের ঝলকানি ঠিকরে পড়ছে। শরীরটা চিকন তবে ভীতি সৃষ্টি করে। তার দিকে তাকালে আলাদা করে সম্মান করতে ইচ্ছা হয়। আমি শপথ করে বলছি, আজ রাতের মতো বেশি আফসোস আর কোনো রাতে করিনি। আমি এজন্য আফসোস করেছি যে, এই নিকৃষ্ট কাজে আমি পা বাড়িয়েছি আর এমন লোকের দিকে অগ্রসর হয়েছি—যার দেহ দুনিয়ায় কিন্তু প্রাণ আখিরাতে বসবাস করে। আপনি যেমনটা মনে করেছেন, সে সেরকম না। তার মতো মানুষ আমার দুই

চোখ কখনোই দেখেনি। আমি মন থেকে ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল যদি তার সাথে দেখা না করতাম।'

কথাগুলো বলে থামল ইরবীদ। ইয়াসারের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো চিন্তা করতে লাগল মনে মনে। দরজার ফাঁক গলে ঠান্ডা বাতাসের আগমনে নড়ে উঠল বাতিটা। দেয়ালের ওপর মেয়েটার ছায়াও সরে গেল। ইরবীদ আবার বলা শুরু করল, 'এই লোকের আত্মা যমীন থেকে আসমানে উড়ে গেছে। আসমানে তার আত্মা পবিত্রতা ও উচ্চতা অর্জন করেছে।'

মেয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ইবরীদের কথাগুলো। দাসের বর্ণনা তাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল একেবারে। মেয়ের কাছে মনে হলো, ইয়াসার যেন মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা। তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগল, 'এরপর কী হলো ইরবীদ?'

ইরবীদ বলল, 'তিনি আমাকে সালাম দিলেন। এরপর আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন তার দৃষ্টি আমার শরীর ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করছিল। আমার অন্তরের কথাগুলো যেন তিনি বের করে নিচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী? বললাম, ইরবীদ। আমার নাম তার পছন্দ হলো না। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, তোমার এই নাম চলবে না। তোমার নাম 'মুরীদ'। মুরীদ মানে জানো? আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তখন তিনি বললেন, মুরীদ হলো ওই ব্যক্তি, যে পবিত্র আত্মা নিয়ে আল্লাহর দিকে পৌঁছতে চায়। মুরীদ, তুমি আল্লাহকে ভয় করো আর পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকো।'

এতটুকু বলে চুপ হয়ে গেল ইরবীদ। এদিকে মেয়েটা অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে তার দিকে। সে ইয়াসার সম্পর্কে জানার জন্য এতটাই আগ্রহী যে, নিজের কথা তো ভুললই, অতিথিদের কথাও ভুলে গেল। ইরবীদ কিছুটা ঝুঁকল। মনে হলো কিছু একটা কুড়িয়ে নিচ্ছে মাটি থেকে। কিন্তু সে আবার দাঁড়াল সোজা হয়ে। মেয়ে তাকে ঝাঁকিয়ে অধৈর্য হয়ে বলল, 'ইরবীদ, তুমি কথা বলো। চুপ করে থেকো না।'

ইরবীদ তার দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, 'আমার মনে হয় আপনি এই ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেই ভালো হয়।'

'ছেড়ে দেবো? এতকিছুর পর! একটা কাজে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পর আবার পিছু হটব?'

মনিবের জোরাজুরিতে ইরবীদ আবার বলা শুরু করল, 'আমি দ্বিধাগ্রস্ত হাত এগিয়ে দিলাম। খুবই লজ্জা পাচ্ছিলাম। তিনি চিরকুট হাতে নিয়ে তাকালেন এক

নজর। তার মুখভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি রেগে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, হায়! যদি যমীনটা দুই ভাগ হয়ে যেত আর আমাকে গিলে ফেলত! কিন্তু ভয়াবহ কিছু শোনার আগেই তাকে বললাম, তিনি শুধু আপনার সাথে নিজের সমস্যার ব্যাপারে কথা বলতে চান। আপনাকে ছাড়া আর কারও কাছে তা বলতে চান না। ইয়াসার মাথা তুললেন। চেহারা থেকে রাগের চিহ্ন কিছুটা চলে গেছে। তিনি বললেন, তা হলে সমস্যা লিখে দিক। এরপর তিনি একটা শব্দ লিখে দিলেন, 'লিখে পাঠান'।'

ইরবীদ চিরকুটটা সামনে রাখল। তারপর পিছিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি দুই হাত দিয়ে তালি বাজিয়ে কিছুক্ষণ চক্কর খেয়ে বলল, 'পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে।'

ইরবীদ তার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হাবীব ইবনু মাসঊদ কি আপনাকে বলেনি যে, ইয়াসারের কাছে পৌঁছতে সাতটি লোহার তালা আছে?'

তার কথা শুনে মেয়ে হাসল। মুক্তাদানার মতো ঝলমল করতে লাগল তার মুখের দুই পাটি দাঁত। সে তার দাসের বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'আমার কাছে মূল চাবি আছে। যে চাবির সামনে সব তালা খুলে যায়। জানো সে চাবি কী?'

হতবিহ্বল দাসের সামনে নিজ হাত দিয়ে নিজের বুকে ইশারা করে বলল, 'আমি...।'

কথাটা শেষ করেই দরজাটা খুলে বলল, 'এই জাদুকরী বিস্ময়কর চাবির সামনে খুলে যাবে সব তালা। এই চাবি হলো নারী!!'

পাশের কক্ষে প্রবেশের আগে ফিসফিস করে বলল, 'আর এখন থেকে তোমাকে মুরীদ বলেই ডাকব।'

সবাই আবার হাসি-ঠাট্টা ও মজায় লিপ্ত হয়ে গেল। এক সময় সকাল হলো। মুয়াজ্জিন মাসজিদ থেকে আযান দিলো, 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ'। এ ডাক শুনে হাবীব ইবনু মাসঊদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হারিয়ে ফেললাম আমাদের জীবনের আরও একটা রাত।'

এরপর একে একে উঠে দাঁড়াল সবাই। তারা ফাজরের সালাতের কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল। রওনা হলো নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে।

অন্তরের আহ্বান

ইয়াসারের বাড়িটা নদীর পাশেই। ফাজরের আযানের আগেই ইয়াসার বের হলো তার বাড়ি থেকে। মাসজিদ পানে পা বাড়াল। বিশ্বের পাণ্ডুলিপিতে নতুন একটি পাতা সংযুক্ত হলো; আজ নতুন একটি দিন। সে যেন শুনতে পাচ্ছে কেউ তাকে ডেকে বলছে, 'আমি নতুন দিন এবং তোমার কাজের সাক্ষী, সুতরাং আজ তুমি পাথেয় গ্রহণ করে নাও। কারণ কিয়ামাতের আগে আমি আর ফিরে আসব না।'

শনশন করে বয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা বাতাস। বিশ্ব যেন গভীর ঘুমে নিমগ্ন। চাঁদকে ঘিরে দেখা যাচ্ছে সাদা আলোর রেখা; যে আলোর উত্তাপ বাতাসের শীতলতা থেকে রক্ষা করছে তার দেহকে। কিছু বাতি বন্ধ হয়ে গেছে, আর বাকিগুলো যেন বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

ইয়াসার হেঁটে যাচ্ছিল। তার জিহ্বা ব্যস্ত আল্লাহর যিকরে। সে মন থেকে উপলব্ধি করছিল এ দৃশ্যের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য। এ দৃশ্য তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল আখিরাতের কথা। এ সময়ের প্রতিটি জিনিসই আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি গলির প্রান্তে যে দারোয়ান ভাইটা চাদরমুড়ি দিয়ে কাজি বাড়ির পাশে ঘুপটি মেরে বসে ছিল তাকে দেখেও আখিরাতকে মনে আসছিল। ঘরগুলো নীরব নিশ্চুপ। জানালাগুলো বন্ধ। রাস্তাটাও জনশূন্য।

নদীতীর থেকে আওয়াজ ভেসে এল তার কানে। নৌকা চালিয়ে যাচ্ছে এক যুবক। যুবকটি তার বৈঠা দিয়ে নৌকা বইছে আর গান গেয়ে যাচ্ছে করুণ স্বরে। হৃদয় জুড়ানো ঠান্ডা বাতাস সেই গানকে বয়ে কানে নিয়ে আসছে। আর পুরো পৃথিবী যেন তন্ময়

হয়ে শুনছে সে গান। সে একাকী গান গেয়ে যাচ্ছিল, "হে আমার রব... তুমি জানো আমার সব..।" তারপর সে আরও কিছু লাইন গাইছিল, যা শোনা যাচ্ছিল না। তবে শেষের লাইনটুকু শোনা গিয়েছিল, যা ছিল, "...ক্ষমা করো গুনাহ্ সব।"

ইয়াসার বুক ভরে ফাজরের নির্মল বাতাস নিল। এর মাঝেই যেন পাওয়া যাচ্ছে আখিরাতের স্বাদ। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ সময় কীভাবে মানুষ ঘুমিয়ে থাকতে পারে? কেন তারা ঘুম থেকে জেগে ভোরবেলার এই নিবিড় শান্ত পরিবেশ থেকে এক আঁজলা পান করে নেয় না? যে ভোরের স্নিগ্ধ বায়ু তাদের জীবনকে গড়ে তুলবে আর তাদের আত্মাকে আলোকিত করে তুলবে। ভোরের এ স্নিগ্ধতা তাদেরকে চির বাস্তবতার মুখোমুখি করে শিখাবে, 'এর থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই ফিরিয়ে নেব এবং এর থেকেই তোমাদেরকে আবার বের করব।'

এই নীরব নিস্তব্ধতা, শান্ত পরিবেশ ও যুবকের করুণ স্বরের মাঝে ইয়াসারের মনে পড়ে গেল আখিরাত-সম্পর্কিত শাইখের আলোচনা। শাইখের আলোচনা সে মনোযোগ সহকারে শুনছিল। শাইখ আখিরাতের দৃশ্যগুলো এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যে, মনে হচ্ছিল সেগুলো একেবারে ঘটছে চোখের সামনে। যেন তিনি পুরো আখিরাত দেখে এসে আমাদেরকে বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছিলেন, আমি স্পষ্ট সতর্ককারী।

শাইখকে কখনও ইয়াসার কাঁদতে দেখেননি। কিন্তু তার আওয়াজ ও গলার স্বর জানান দিচ্ছিল, তিনি খুবই প্রভাবিত। তার অন্তর থেকে কান্না যেন বেরিয়ে আসছিল। তিনি যেন কেঁদেই চলেছেন নিঃশব্দে। আর ইয়াসার তো আবেগী যুবক। সেও নিজেকে বাঁচাতে পারছিল না কান্না থেকে।

শাইখের আলোচনা ফাজরের সালাতের পরপরই শুরু হয়। কয়েক মিনিটের বেশি হয় না। তার আলোচনা অন্তরে কাঁপুনি সৃষ্টি করে। মানুষের অন্তরকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহকে চেনার প্রতি পথ দেখিয়ে দেয়।

তিনি শান্ত গলায় কথা বলা শুরু করেন। কথাগুলো নতুন, সুন্দর ও প্রয়োজনীয়। কোনো কথা বাড়িয়ে বলেন না, আবার কোনো অপরিচিত শব্দও বলেন না। আবার বক্তাদের মতো বক্তব্যও শুরু করেন না।

তার কথাগুলো তার শিষ্যদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করে। তার শিষ্যরা আরও শুনতে চায়, আরও জানতে চায়। তাদের মন যেন বলে উঠে, শাইখ! আপনি থামবেন না। আপনার বক্তব্য চালিয়ে যান।

কিন্তু তারা এ কথা বলত না। কারণ তারা জানে যে, শাইখ তাদের যথেষ্ট পরিমাণেই বলেছেন। তিনি একই বিষয়ের কথা যথাসময়ে চালিয়ে যাবেন আগামীকাল।

ইয়াসার বসবাস করছে এই ঈমানি পরিবেশে। ঈমানের এই ছোঁয়া তার জীবনকে স্পর্শ করেছে। ঈমান তার অন্তরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে; আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু এ দরজায় টোকা দিতে পারে না। তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেবল আল্লাহর আনুগত্যেই সচল হয়। তার আত্মা ঈমানের ঝলমলে রঙে রঙিন হয়। এ ঈমান তার অন্তরকে আলোকিত করে। সজীব করে তোলে আত্মাকে। আত্মার শরীর থেকে টেনে খুলে নেয় অলসতার চাদর, আর পরিয়ে দেয় আনন্দ ও প্রশান্তির কারুকার্যখচিত চাদর।

ইমাম সাহেবের পড়াটা করুণ স্বরে শোনা যাচ্ছে। তার গলার করুণ স্বর সকলের হৃদয়ে সৃষ্টি করছে এক অদ্ভুত কাঁপুনি। মসজিদের বাতিগুলো থেকে আসছে মৃদু উষ্ণ আলো। সে আলো সাদা দেয়াল, নিশ্চুপ স্তম্ভ.. এ সকল কিছুতেই যেন কাঁপুনি অনুভূত হচ্ছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম যেন নেমে এসেছেন ওই সময়টাতে। তিনি তিলাওয়াত করছেন :

إن قرآن الفجر كان مشهودا

"নিশ্চয় ফাজরের সালাত উপস্থিতির সময়।" (সূরা ইসরা : ৭৮)

ফাজরের সালাতের পর শাইখ বসে আলোচনা করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে তারা তিলাওয়াতের স্পর্শে সবাই আসমানে একবার ভ্রমণ করে এসেছে। শাইখ তাদেরকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা বলছিলেন। ইউসুফ, যে যুবকটি নিজেকে প্রেমময়ী নারীর হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, ধৈর্যধারণ করেছিলেন। ইউসুফের দৃঢ়তা, পবিত্রতা, আল্লাহভীতি, ইবাদাত—এগুলোর বর্ণনা দিলেন শাইখ।

তিনি কুরআনের ভাষাতেই কথা বলছিলেন। কুরআনের চিত্রকে আকর্ষণীয় করে ফুটিয়ে তুলছিলেন সকলের কাছে। যেন তার ফুসফুস থেকে এই মহান কিতাবেরই শ্বাস-প্রশ্বাস বের হচ্ছে। তার কথায় যেন সালফে সালেহীনের কথাগুলোই প্রতিফলিত হচ্ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের কাছে মনে হচ্ছিল, তারা সবাই একেকজন ইউসুফ।

শাইখের আলোচনার প্রভাব এত বেশি হওয়ার কারণ শিষ্যদের অন্তরে শাইখের অবস্থান, তার কথার স্পষ্টতা, কথা বলার ভঙ্গি, ইশারা—সবকিছু। শাইখের চোখে তার শিষ্যদের প্রতি সুস্পষ্ট ভালোবাসা। যে কারণে প্রত্যেকেরই মনে হচ্ছিল যেন শাইখ তার সাথেই কথা বলছে, তার দিকেই ইশারা করছে, তাকেই আহ্বান করছে।

নিজ হাতে ধরে তাকে নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাসীদের কাফেলায়। সহায়তা করছে ঈমানের সমুজ্জ্বল পথ ধরে চলতে।

ইয়াসার প্রায়ই যেত আতর বিক্রেতাদের দোকানে। সেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম মানের আতরগুলো জমা-করা হয়। নারী-পুরুষের সমাগম সেখানে নিত্যদিনের ব্যাপার। নারীদের জন্য এই আতরের দোকান থেকে বেশি প্রিয় আর কিছুই নেই; বিশেষ করে ভিনদেশি নারীদের। রোম-তুরস্ক-পারস্য-ভারত এবং আবিসিনিয়া থেকে যেসব নারী আসত, তাদের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা এটা। আরও অনেক দেশ আছে যার নাম আমাদের অজানা, সেখান থেকেও অনেক মানুষ শুধু এই আতরের জন্যই ছুটে আসে।

আতর বিক্রেতাদের বাজারটা বেশ পরিষ্কার ও সুন্দর। পাশাপাশি সারি-সারি অনেকগুলো ছোটো ছোটো দোকান। দোকানগুলো বেশ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। দোকানের বাতিগুলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। আতরের পাত্র ও ফুলের তোড়াগুলো বেশ পরিপাটি করে সাজানো।

ইয়াসার প্রায়ই যেত আতর বিক্রেতা আবূ আলি ইসপাহানির দোকানে। সেখান থেকেই নিজের ব্যবহার্য আতর কিনত। সে বলত, আল্লাহর নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আতর পছন্দ করতেন।

ওদিকে প্রচেষ্টার দুই সপ্তাহ কেটে গেছে মেয়েটার। এক বুধবার সূর্যের আলোতে রঙিন পড়ন্ত বিকেলে ইয়াসার আবূ আলি ইসপাহানির কাছে এল। আবূ আলি ছিলেন মোটা ও বেঁটে লোক। তার দাঁড়ি মেহেদীর রঙে রঙিন। তিনি সারাক্ষণ আতর নিয়েই কথা বলতেন।

কিছুক্ষণ পরই ওই মেয়ে আর তার দাস 'মুরীদ' ওই দোকানে এসে দাঁড়াল। মেয়ে ইয়াসারের দিকে তাকালই না। বরং সে ফার্সি ভাষায় আতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। এদিকে মুরীদ ইয়াসারকে সালাম দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আতর বিক্রেতা সাদর-সম্ভাষণ দিয়ে গ্রহণ করলেন মেয়েটাকে। তার কাছে সবচেয়ে ভালো ভালো যে আতর ছিল, সেগুলো একে একে দেখাতে থাকলেন। কিন্তু সে কোনোটাই পছন্দ করছিল না। ইয়াসার মেয়েটাকে পাত্তাই দিলো না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আতর বিক্রেতা একটা আতর এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা খুবই ভালো মানের আতর। ইয়াসারও এটা ব্যবহার করেন। কি, ঠিক বলেছি না?'

ইয়াসার তার কথার উত্তর দিলো না। এমনকি তাকালও না।

কিন্তু ওই মেয়ে তার দিকে এক পলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার বিক্রেতার সাথে কথা বলতে লাগল, 'আপনি একবার বলেছিলেন আপনার কাছে চীন থেকে আনা আতর আছে...।'

বিক্রেতা মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলো, 'দুঃখিত, শেষ হয়ে গেছে। একটুও নেই। ওই আতরটা খুব ভালো ছিল। ওটা চীনদেশের ফুল থেকে বের করা হয়। ওষুধ হিসেবে কাজ করে ওটার পাপড়িগুলো। ওটা...।'

আতর বিক্রেতা লক্ষ করে দেখলেন, মেয়ে তার কথা শুনছে না। বরং গোপনে তাকিয়ে আছে ইয়াসারের দিকে—'এই তা হলে সেই ইয়াসার, যার কথা বারবার শুনেছি। হাবীব ইবনু মাসঊদ তা হলে বাড়িয়ে বলেনি।'

আতর বিক্রেতা গলা খাঁকারি দিয়ে মাথার পাগড়িটা ঠিক করে বলল, 'আপনি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। আমি বাজারের শেষ মাথা থেকে নিয়ে আসছি।'

ইয়াসার চলে যাওয়ার উপক্রম হলো। বাজারে থাকতে চাইল না বেশিক্ষণ। যতক্ষণ প্রয়োজন, ততক্ষণই সে বাজারে থাকে। এরপর সব সময় সে চলে যায়।

মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে বলল, 'একটু শুনবেন?'

ইয়াসার তার দিকে তাকালে। চোখাচোখি হলো দুজনের। ইয়াসার সাথে সাথে চোখ নামিয়ে ফেলল। মুরীদ তাকে যেই কাগজের টুকরোটা দিয়েছিল, তার কথা মনে পড়ল। ইয়াসার বলল, 'বলুন।'

বাদ্যযন্ত্রের করুণ স্বরের মতো মেয়েটা বলল, 'এখনই বলতে হবে?'

ইয়াসার তার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'হ্যাঁ।'

তার সাথে কথা চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় বলল, 'কিন্তু এখানেই? এই বাজারে?'

ইয়াসার নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

আতর বিক্রেতা ততক্ষণে ফিরে এসেছেন। কপালের ঘাম মুছে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'ওই ব্যাটার কাছেও সেটা নেই।'

মেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি আবার আসব তা হলে।'

যাওয়ার আগে ইয়াসারের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল মেয়েটি। লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল ইয়াসার। আতর বিক্রেতার কথায় তার ভাবনায় ছেদ পড়ল, এই দাসী পারস্যের না। ইয়াসার তার দিকে তাকাল। আতর বিক্রেতা আবার বলল, 'এই

মেয়ে পারস্য থেকে আসেনি। আমি তার কথার ধরনেই বুঝে গিয়েছি।'

আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে আতর বিক্রেতা আবূ আলি।

ওই মেয়ে ইয়াসারের কোনো ক্ষতিই করতে পারল না। বালুকণা যেমন এক খণ্ড মেঘের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তেমনটাই হলো। আর কীভাবেই-বা ক্ষতি করবে ও? শয়তানের জন্য যত ছিদ্র ছিল, সবই বন্ধ করে রেখেছে ইয়াসার।

তবে সেই রাতে এশার সালাত আদায় করে কিয়ামুল লাইলে দাঁড়ানোর আগে ইয়াসারের কাছে মনে হলো সে যেন ফিসফিস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। সে এটা নিয়ে সামান্যও মাথা ঘামাল না। বরং সালাতে দাঁড়িয়ে গেল। কোনো কিছুই তাকে বিরত রাখতে পারল না সালাত থেকে। কারণ রাতই তো নেককার বান্দাদের বাহন। আর গভীর রাতেই বান্দারা পৌঁছায় আল্লাহর সবচেয়ে কাছে।

আট রাকাআত সালাত আদায় করার পর বিতর সালাত আদায় করে ইয়াসার বিছানায় শুয়ে পড়ল। মনোযোগের সাথে সে পড়ল :

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

"হে আমার রব ! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ রাখলাম। তোমার নামেই তা ওঠাব। তুমি যদি আমার আত্মা নিয়ে নাও তবে তাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তা হলে তা সেভাবে সংরক্ষণ করো যেমনিভাবে তুমি তোমার নেককার বান্দাদের সংরক্ষণ করে থাকো।" (আবূ দাঊদ, আস সুনান : ৫০৫০)

এরপর ঘুমে ঢলে পড়ার আগ মুহূর্তে সে হঠাৎই অনুভব করল বিকেলের সেই সুরের হাতছানি। যেই সুর, যেই ফিসফিস আওয়াজ বিকেলে ওই মেয়ের মুখ থেকে শুনেছিল, যে মেয়ে তার কাছে এসেছিল একটা সমস্যা নিয়ে।

ইয়াসার দ্রুত ভাবনাগুলোকে মাথা থেকে সরিয়ে ফেলল। তার কাছে মনে হলো এই ভাবনাগুলো অতি সন্তর্পণে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে তার তাকওয়ার দালানে। এটা আসমান থেকে আগত কোনো সাহায্য নয়। সে আবার সালাতে পড়া আয়াতকে স্মরণ করতে লাগল :

إن لدينا أنكالا وجحيما

“আমার কাছে আছে শেকল আর দাউদাউ করে জ্বলা আগুন। আছে গলায় আটকে যায় এমন খাবার। আরও আছে মর্মান্তিক শাস্তি।” (সূরা মুজ্জাম্মিল : ১৩)

হায়! কী ভয়াবহ শাস্তি ভ্রান্ত মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে। যে ব্যক্তি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আল্লাহর রহমত থেকে। মানুষেরা ঘুমিয়ে আছে। একদিন তারা জেগে উঠবে। কিন্তু তাতে কী লাভ হবে? মৃত্যুর পর তারা হাড়ে-হাড়ে টের পাবে। তার দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। এমনকি ভিজে গেল বালিশ। তারপর সে ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

চিঠি

মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা—যেদিন মেয়েটা আতরের দোকানে ইয়াসারের সাথে দেখা করেছিল, সেদিন হাকীম ইবনু মাহমুদের বাড়িতে আসর বসল। তার ড্রইংরুমটা বেশ বড় ও প্রশস্ত। অনেকগুলো সাদা মোমবাতির আলোতে রাতও মনে হচ্ছিল দিনের মতো। শাম থেকে আগত পর্দাগুলো ইয়েমেনি কারুকার্যে খচিত। আসবাবপত্রও সুন্দরভাবে সাজানো। উপস্থিত অতিথিদের কথাগুলো আওড়াচ্ছিল উঁচু তাকের ওপর বসে থাকা একটা তোতা পাখি।

আবূ মাহমূদ বারবার ভেতরে যাচ্ছিল আর আসছিল। সে সবাইকে হাসাচ্ছিল বিভিন্ন কৌতুক বলে। সাঈদ ইবনু মানসুর তো অট্টহাসি দিচ্ছিল। হাস্‌সানও মুচকি হাসি হাসছে। এদিকে হাবীব স্বাভাবিকভাবে খাবার টেবিলে কনুই রেখে দুইগালে দুই হাতের তালু স্পর্শ করে বসে আছে। তার চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট।

হাস্‌সান তার দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কী হলো হাবীব? তোমাকে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছে যে! মনে হচ্ছে যেন দুনিয়ার সব চিন্তা তোমার মাথার ওপর এসে বসেছে! আগে আমরা হাসি-ঠাট্টা করলে তো তুমিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করতে!'

হাবীব সামান্য একটা হাসি দিয়ে ঠিকভাবে বসে দুঃখভরা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এরপর বলল, 'একটা জবাই-করা পাখির মতো আমি ব্যথায় ছটফট করছি।'

মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, 'কে তোমাকে জবাই করল হাবীব?'

মনে হলো যেন হাবীব কিছু শুনলই না। বরং হাস্‌সানের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'হাস্‌সান, শুনো। হাকীম শার্‌লম্যানের দেশ থেকে ভ্রমণ শেষ করে আসার আগ পর্যন্ত আমিও ইয়াসারের দলে ছিলাম। সব সময় ইবাদাত-বন্দেগি করতাম। জ্ঞানের মাজলিসগুলোতে শরীক হতাম। মাসজিদে সব সালাত আদায় করতাম; এমনকি ফাজরের সালাতও বাদ দিতাম না ঠান্ডার দিনগুলোতেও। আমি ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করতাম, ঠান্ডা অনুভবই করতাম না। তারপর চলে যেতাম মাসজিদে। আমার জীবনটা অন্যরকম ছিল। একেবারে ফেরেশতাদের মতো। কিন্তু হাকীমের সাথে দেখা হওয়ার পর...

এ কথা বলে সে মাথা নিচু করে ফেলল। তারপর হাতে হাত ঘষে কথা চালিয়ে গেল। মেয়েটা, হাস্‌সান, সাঈদ, এমনকি তোতা পাখিটাও মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল তার কথা।

সে কথা চালিয়ে গেল, 'হাকীমের পিছু নিলাম...। আমার গলার দড়িটা তার হাতে ধরিয়ে দিলাম। আর সে আমাকে হারামের দিকে নিয়ে চলল। তুমি কি জানো হাস্‌সান, আমরা এমন এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি যার গন্তব্যটা বন্ধ? আমাদের মাত্র একটাই গন্তব্য খোলা আছে।'

মেয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কোথায় সেই গন্তব্য?'

হাবীব হেলান দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'জাহান্নাম।'

এরপর দুই হাত একত্র করে বলল, 'যদি-না আল্লাহ আমাদেরকে তার রহমত দিয়ে ঘিরে ধরেন।'

হাবীব এবার চুপ হয়ে গেল। মেয়ের দু-চোখ তার কাছ থেকে আরও জানতে চাচ্ছিল। হাবীবকে মনে হচ্ছিল একজন বন্দির মতো। সে আবার মাথা তুলল। দেখতে পেল মেয়েটা তার অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করছে। তার মনে প্রশান্তি দিলো মেয়েটার এ দৃষ্টি। সে বলে যেতে লাগল, 'আমি এমন এক বাগানে বসবাস করতাম যা ফুলের সৌরভে মৌ মৌ করত; যার স্নিগ্ধ ছায়া আলোড়িত করত আমার জীবনকে। কিন্তু এখন! যেখানেই তাকাই দেখতে পাই, গভীর এক গহ্বর যেন আমাকে দৈত্যের মতো গ্রাস করতে চায়। এ যেন সেই সংকুচিত জীবন যার কথা কুরআন কারীমে উল্লেখ আছে :

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا

"আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত।" (সূরা ত্ব হা : ১২৪)

আবূ মাহমূদ এবার এসে তোতা পাখিটা হাতে নিয়ে অন্য কক্ষে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলল, 'তোমার ওয়াজ শেষ হলে আমাকে বোলো। আমি আসব।'

সবার অট্টহাসিতে কেঁপে উঠল ঘরটা। হাবীব উত্তর দিতে চাইছিল। কিন্তু এ সময় দরজায় হালকা কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল। আবূ মাহমূদ দাসকে ডেকে বলল, 'দরজায় কে, দেখো তো।'

দাস কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। দাসটা পঞ্চাশোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। সে সাদা পোশাক ও অনারবি টুপি পরিহিত। তার দু-হাত ও চোখ দিয়ে ইশারা করে কথা বলতে লাগল। কিন্তু উপস্থিত কেউ কিছুই বুঝল না। সবাই দাসের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করল। আবূ মাহমূদ তার নীল চোখ দুটো দিয়ে দাসের দিকে ভালোভাবে তাকাল। বলল, 'কী খবর?'

দাস অস্পষ্ট শব্দে আওয়াজ করে গেল আর দু-হাত ও চোখ দিয়ে ইশারা করে গেল। সবাই মনে করল মারাত্মক কিছু ঘটেছে। আবূ মাহমূদ ধৈর্যহারা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হয়েছেটা কী তোমার? কথা বলো।'

সে তার হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ঘাড়টা নিচু করে মাথাটা আবূ মাহমূদের কাছে নিয়ে এসে বলল, 'ইয়াসার এসেছে।'

সবাই একসাথে চিৎকার করে বলল, 'কে?'

সে আবার নিচু স্বরে উত্তর দিলো, 'ইয়াসার এসেছে।'

হাবীবের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে রাগে গজ-গজ করতে করতে দাঁড়িয়ে বলল, 'আবূ মাহমূদ! তুমি এ কাজ করতে পারলে!'

আবূ মাহমূদ হাত দিয়ে ইশারা করে হাবীবের কথা নাকচ করে বলল, 'হাবীব, তোমার কী হলো? সে কেন এখানে এসেছে, তা তো আমি জানি না!'

এ কথায় হাবীবের রাগ নামল। কিন্তু সে বলল, 'যদি তাকে এখানে প্রবেশ করাতেই হয়, তা হলে আমি অন্য কক্ষে চলে যাব। কারণ আমি চাই না, সে আমাকে এখানে দেখুক।'

হাকীমের মাথায় শয়তানী বুদ্ধি খেলল। সে মুচকি হেসে বলল, 'তুমি যেমনটা চাও হাবীব।'

সবাই পাশের রুমে চলে গেলে হাকীম ইশারা করে থাকতে বলল মেয়েটাকে। তারপর তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে!'

মেয়েটা তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কী বুঝাতে চাচ্ছ?'

'তুমি তার সাথে দেখা করবে।'

মেয়েটা নিজের বুকে আঘাত করে চিৎকার করে বলল, 'আমি? এখানে?'

হাকীম তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুমি তার সাথে দেখা করবে।'

মেয়েটা তার বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে পিছু হটে বলল, 'অসম্ভব!'

হাকীম আশ্বাস দিয়ে বলল, 'এটাই তো তোমার সুবর্ণ সুযোগ।'

মেয়েটা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'কখনও না।'

হাকীম নিচু স্বরে বলল, 'কেন? তুমি তাকে চিরকুট লিখেছ না?'

মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু...'

হাকীমের দু-চোখ চকচক করে উঠল। সে বলল, 'তা হলে তাকে এখন জিজ্ঞাসা করো।'

মেয়েটা তার কথা বুঝল না। দ্রুত জিজ্ঞাসা করল, 'কী জিজ্ঞাসা করব? তোমার কী মনে হয়, আমার কী জিজ্ঞাসা করা উচিত?'

সে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'তুমি না লিখে পাঠালে যে তুমি তার সাথে দেখা করতে চাও। তোমার একটা সমস্যা আছে?'

মেয়েটা বলল, 'তা লিখেছি বটে।'

'তা হলে এখনই বলে ফেলো। এই তো সময়।'

'কিন্তু আমার তো কোনো সমস্যা নেই।'

আবূ মাহমূদ হাত দিয়ে দস্তরখানায় আঘাত করে বলল, 'তার সাথে দেখা করাটাই আসল। তাকে বলো যে...। না থাক, তাকে কিছু বলার দরকার নেই। শুধু দেখাটা করো, বাকিটা আমি দেখব।'

তারপর আবূ মাহমূদ বেরিয়ে গেল। একটু পরে ইয়াসারকে সাথে করে অভ্যর্থনা দিয়ে নিয়ে এল।

প্রবেশ করল ইয়াসার। তার পবিত্র দুই চোখ ও দাড়ির কারণে প্রকাশ পাচ্ছে গুরু-

গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য। সে কক্ষের মাঝে বসে বলল, 'দুই সপ্তাহ আগে সাঈদ আমার কাছে এসে জানিয়েছিল তোমার কাছে আবূ হামেদ আল-গাযালির হাতে-লেখা একটা পত্র আছে। পত্রটা সে লিখেছিল তার এক ছাত্রের করা একটা প্রশ্নের উত্তরে।

আবূ মাহমূদ কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে রইল। ইয়াসার বলল, 'শুনলাম সেটা খুবই ছোটো একটা পত্র। তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ।'

আবূ মাহমূদ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না, আমার মনে হয় না এ রকম কোনো চিঠি আমার কাছে আছে।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আচ্ছা! তাও আমি খুঁজে দেখছি পাই কি না।'

আবূ মাহমূদ কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর নিয়ে হাজির হল একটা বই নিয়ে। ইয়াসার সেটা হাতে তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগল। বলল, 'এটা তো 'ইহ্ইয়াউদ্দীন' বই। এটা ইমাদউদ্দীন আস-সামারকান্দির হাতে-লেখা। আমি যেটা চাচ্ছি সেটা একটা ছোট্ট চিঠি। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার। এর শিরোনাম হলো, 'আইয়ূহাল ওয়ালাদ'। এটা ইমাম গাযালি তার এক ছাত্রকে লিখে দিয়েছিলেন।

আবূ মাহমূদ মুচকি হেসে দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'তুমি তো জানোই যে আমি কখনও তোমার কাছ থেকে কিছু লুকাই না। সেটা আমার কাছে যত প্রিয় জিনিসই হোক না কেন।'

কিছুটা পিছনে গিয়ে সে বলল, 'আমি আবার খুঁজে দেখতে যাচ্ছি।'

আবূ মাহমূদ বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'একজন তোমার সাথে দেখা করতে চায়। তুমি যদি অনুমতি দাও।'

ইয়াসার মুচকি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আসতে বলো।'

আবূ মাহমূদ আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ইয়াসার বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো উল্টে লিপিকারদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও মন্তব্যগুলো দেখতে লাগল। এ সময় পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হেঁটে এল মেয়েটা। আচ্ছা, মেয়েটার নামই বলা হয়নি। ওর নাম ছিল সারশীর। সারশীরের পরনে ধবধবে সাদা জামা। সে তার লম্বা কালো চুল, মায়াবী দুই চোখ ও গোলাপের মতো সুন্দর চেহারা নিয়ে প্রবেশ করল। তার প্রাণবন্ত পদক্ষেপ ও কামনাভরা দৃষ্টি আকৃষ্ট করার মতো।

সারশীর ঘরের মাঝে এসে উচ্চৈঃস্বরে সালাম দিলো। তার প্রবেশ লক্ষ করেনি

ইয়াসার। এবার তার আওয়াজ শুনে চোখ তুলে তাকাল। দুই জোড়া চোখের মিলন হলো। ওযুর পানিতে সিক্ত পবিত্র চোখের সাথে ডাগর কালো দু-চোখের মিলন। দ্রুত চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল ইয়াসার, 'কী জন্য এসেছেন আপনি?'

সারশীর তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে চাইল যেন ইয়াসার তার দিকে তাকায়। কারণ তার পবিত্র চোখ ও শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারায় সে এমন এক নূরের ঝলকানি দেখতে পেল, যা আগে কখনও কোনো পুরুষের চেহারায় সে দেখেনি।

তার দিকে না তাকিয়েই ইয়াসার আবার বলল, 'কী জন্য এসেছেন আপনি?'

কিন্তু সারশীর নিরুত্তর। ইয়াসারের দিকে অপলক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আহ্.. যদি প্রতিটা পুরুষ ইয়াসারের মতো হতো। নিজের মূল উদ্দেশ্য সে ভুলে গেল। সে চেয়েছিল ইয়াসারকে তার বশীভূত করবে। কিন্তু তাকে যেন বশ করে ফেলেছে ইয়াসার। ইয়াসার তার জবাবের অপেক্ষায় রইল। সে দ্রুত সাক্ষাৎ শেষ করার জন্য বলল, 'আপনার পত্রে লিখেছিলেন যে, আপনার একটা সমস্যা আছে।'

সারশীর কোনো উত্তর দিলো না। তার আফসোস হতে লাগল কৃতকর্মের জন্য।

ইয়াসার আবার চোখ তুলে তাকে কথা বলতে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'আপনি কি কথা বলবেন না?'

আবার মিলিত হলো দু-জোড়া চোখ। পবিত্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সাথে গভীর দুঃখী এক যুবতীর দৃষ্টি।

ইয়াসার তাকে বলল, 'কথা বলুন...।'

কিন্তু সারশীর কান্নায় ভেঙে পড়ল। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দৌঁড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

'মেয়েটা কাঁদল কেন? কী এমন সমস্যায় আছে, যেটা সে বলতে পারল না? আর তার কাছেই কেন সমস্যা পেশ করল? অন্য কেউ কি ছিল না? অথচ ইয়াসার তো তাকে চিনেও না, তার সম্পর্কে আগে শোনেনি!'—ইয়াসারের মনে গিজগিজ করতে লাগল ভাবনাগুলো।

আবূ মাহমূদ কিছুক্ষণ পর ওই পত্রটা নিয়ে ইয়াসারের কাছে এল। তার হাতে পত্রটা দিয়ে বলল, 'এটাই কি তুমি চেয়েছিলে?'

ইয়াসার পত্রটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে বলল, 'হ্যাঁ, এটাই সেটা। তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো!'

আবূ মাহমূদ সলজ্জ ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বলল, 'না, বরং আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেবো। তুমি আমাদেরকে দেখতে এসে ধন্য করলে।'

ইয়াসার আবূ মাহমুদের সাথে মুসাফাহা করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি দুই দিন পর তোমাকে এটা ফেরত দিয়ে দেবো।'

আবূ মাহমূদ তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বলল, 'ফেরত দিতে হবে না। আমি তোমাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দিলাম। তুমি আমাদেরকে প্রতিদিন দেখতে আসবে।'

ইয়াসার তার বাড়ির পথে রওনা হল। বাড়িতে যেতে যেতে মেয়ের কথা ভাবতে লাগল—'কী এমন সমস্যা যা তাকে এত দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে? এমনকি তাকে এত কষ্ট দিয়েছে যে, সে কথাই বলতে পারেনি?'

ইয়াসারের চিন্তা-চেতনায় তার সুন্দর চেহারাটাই বারবার ভেসে উঠল। তার মলিন মুখখানি যেন তাকিয়ে আছে ইয়াসারের দিকে। মাথায় ভেসে এল সারশীর কান্নামাখা মুখের ছবি। জীবনে এত সুন্দরী, এত অসাধারণ মেয়ে ইয়াসার কখনও দেখেনি। আবূ আলি ইসপাহানির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তার সাথে ফারসি ভাষায় যখন মেয়ে কথা বলেছিল, তখন গলার স্বরটা কী সুমিষ্ট ছিল!

ঘরে পৌঁছনোর আগে তার মাথায় ভেসে এল শাইখের আলোচনা। নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কথা মনে পড়ল। তার কাছে মনে হলো যেন তাকে সাবধান করছেন শাইখ। সে দ্রুতপদে হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে। বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিলো ছোটো বোন সানা। স্বচ্ছ দু-চোখ, পূর্ণিমার মতো উজ্জ্বল চেহারা ও মুচকি হাসি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?'

ইয়াসার তার মুখটা চেপে ধরল। তারপর তার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'এশার সালাত আদায় করেছ?'

তার হাত থেকে পালিয়ে সানা উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, করেছি।'

ইয়াসার প্রথমবারের মতো অনুভব করল যে, তার অন্তর কিছুটা কালো হয়ে গেছে। সে দ্রুত ওযু করে দাঁড়িয়ে গেল সালাতে।

পথে

হাবীব ইবনু মাসঊদ সত্যই বলেছিল-

'ইয়াসারের অন্তরে পৌঁছতে হলে খুলতে হবে সাতটা দরজার লোহার তালা।'

কিন্তু এই সাত দরজা কি এতগুলো কড়া নাড়ার সামনে টিকে থাকতে পারবে? বারবার দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ার উপক্রম কি রোধ করতে পারবে?

ইয়াসার ফাজরের সালাত আদায় করে শাইখের আলোচনা শোনার পর প্রতিদিন কিছু সময় নিয়ে কুরআনের এক পারা তিলাওয়াত করে। এরপর কিছু নববি মাসনূন যিকর করে। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। সকালের নাস্তার সময় এলে মায়ের সাথে নাস্তা করে। তার মা খুবই হাসি-খুশি ও চঞ্চল। ছোটো বোন সানাও সব সময় হাসি-খুশি থাকে। তার মুখটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করে। সানা মেয়েটা দেখতে খুবই ফর্সা। মুখটা খুবই স্বচ্ছ। সানার একটা বড় বিড়াল আছে। বিড়ালটা তাকে ছেড়ে সামান্য সময়ও থাকে না। ছায়ার মতো সব জায়গায় তাকে অনুসরণ করে বেড়ায়। শুধু ঘুমানোর সময়ই বিড়ালটা তার থেকে আলাদা হয়।

ইয়াসার মাসজিদ থেকে ফেরার আগেই ঘর থেকে বের হয়ে যান তাদের বাবা। তারপর ইয়াসার নাস্তা করে বাবার কর্মক্ষেত্রে চলে যায়। সেখানে বেচা-কেনা, হিসাবকিতাব, দেনা-পাওনা মেটানোর কাজে তার বাবাকে সাহায্য করে।

সেদিনের উষ্ণ সকালে সূর্য কিছুটা ওঠার পর বাজারের পথে রওনা হলো ইয়াসার। বাজারের কোনো এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলার সময় তার চোখ পড়ল সারশীর ওপর।

আবার মুখোমুখি হলো দুজন।

সারশীর তার পাশে মুরীদকে নিয়ে হেঁটে চলছিল। তার মাঝে লজ্জাশীলতা ও গাম্ভীর্য বিদ্যমান ছিল। সে ডানে-বামে কোনো দিকেই ফিরে তাকাচ্ছিল না। কিন্তু ইয়াসারকে দেখে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। এই দৃষ্টির অর্থ বুঝল না ইয়াসার। এ দৃষ্টির মাঝে সাহস, বেদনা ও লজ্জার এক অদ্ভুত মিশ্রণ ছিল। দ্রুত মন থেকে মেয়েকে সরিয়ে বাজারে আসার পর বাবার সাথে কাজে মগ্ন হয়ে পড়ল ইয়াসার।

দ্বিতীয় দিনও আবার দেখা হয়ে গেল তার সাথে। ইয়াসার এবার খুবই অবাক হল। সে আবুল ফিদা আল-মাওরিদির সাথে কথা বলছিল। সেদিন ফাজরের সময় কেন আবুল ফিদা মসজিদে আসতে পারেননি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিলেন। আবুল ফিদা তার বাসায় স্ত্রী ও অসুস্থ পুত্রকে নিয়ে সমস্যায় আছে। ডাক্তারের কাছে নিতে নিতে সে ক্লান্ত। এই ঘটনাটাই সে খুলে বলছিল ইয়াসারকে। এমন সময় ইয়াসার পাখির কিচিরমিচির আওয়াজের মতো একটা ডাক শুনে চমকে গেল।

সে তাকাল।

দেখতে পেল তাকে।

সমস্ত সৌন্দর্য ও আকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে মেয়েটা। বাম চোখে একটা ইঙ্গিত করে তার হৃদয় স্পর্শ করে মেয়েটা চলে গেল। দ্রুত চোখ নামিয়ে ফেলল ইয়াসার। আল্লাহর কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল।

এরপর আবার চলা শুরু করল রাস্তায়।

তৃতীয় দিন ইয়সার মাকে নাস্তা তৈরির জন্য তোড়জোড় করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরপর সে ঘরের আঙিনায় এসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখছিল সূর্যটা কত দূর উঠল। মেহেদীর রঙে রঙিন বিড়ালের পিছনে ছুটতে গিয়ে সানা লক্ষ করল তার এই উদাসীনতা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাইজান, আপনার সাথে কি কারও দেখা করার কথা আছে?'

বোনের কথা যেন জাগিয়ে তুলল ইয়াসারকে। সে ইস্তেগফার পড়ে বুকের গভীরে পুঞ্জিভূত ধুলার আস্তরণ মুছে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল।

ইয়াসার আজ ইচ্ছা করেই অন্যান্য দিনের থেকে দেরিতে বের হলো। তার মা দেখতে পেল যে অন্যান্য দিন তার ছেলে নাস্তা দ্রুত প্রস্তুত করতে বললেও আজ দেরি হলেও কিছু বলছে না।

শহরের বাড়িগুলো রাস্তার দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। একটা আরেকটার গায়ে লেগে আছে। শুধু কয়েকটার মাঝে সামান্য ফাঁক দিয়ে নদী দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু বাড়ির বারান্দায় ফুলের টবে গজিয়েছে রঙিন ফুল। নদীর কিনারে অবস্থিত বাড়িগুলোর জানালা খুলে দেওয়া হলে রঙিন কারুকার্যখচিত পর্দাগুলো সূর্যের আলোতে অপরূপ সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটায়।

ইয়াসার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার অন্তর আজ প্রশান্ত। কারণ তার মনকে সে পবিত্র করতে পেরেছে ওই মেয়ের ছবি থেকে। রাস্তার অধিকাংশ পথচারী তাকে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছে। সেও সালামের মাধ্যমেই জবাব দিচ্ছে তাদের সম্ভাষণের। পথিমধ্যে ওসমান চাচার সাথে দেখা। ওসমান চাচার বয়স এক শ পেরিয়ে গেছে। সাদা দাড়ি ও চুল। মুখটা লালচে। তবুও তার শরীরে যেন যৌবনের উত্তাপ রয়ে গেছে। তিনি এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন। তবে ডান হাতে ধরা একটা শক্ত লাঠির ওপরে নির্ভর করেন। তিনি আশি বছরেরও বেশি সময় ধরে সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনও ব্যবসায়ী, কখনও নাবিক; আবার কখনও-বা জাহাজ-চালক হয়ে। এ কারণে তাকে দেওয়া হয়েছে তার উপযুক্ত উপাধি—'সমুদ্রের বাবা'।

ওসমান চাচা দাঁড়িয়ে ইয়াসারের কাছে তার নিজের, বাবা-মায়ের এবং ছোটো বোনের খোঁজ-খবর নিল। এরপর কোনো ভূমিকা ছাড়াই দেওয়া শুরু করল চীনদেশে নিজের একটা ভ্রমণের বর্ণনা। কীভাবে ভ্রমণকালে তার জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। ঢেউয়ের ধাক্কায় কী করে তিনি সমুদ্রতীরে পৌঁছলেন। কীভাবে সেখানে একটা গ্রামে এসে আশ্রয় নেন। এরপর গ্রামবাসী যখন জানতে পারল যে তিনি মুসলিম, আরব দেশে থাকেন, মক্কা-মদীনা দেখেছেন এবং হাজ্জ করেছেন...।

এতটুকু বলে ওসমান চাচা প্রচণ্ড কাশতে শুরু করলেন। কাশতে কাশতে তার চেহারা লাল হয়ে গেল। কাশি থামার পর লাঠি দিয়ে সজোরে মাটিতে আঘাত করে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'তখন তারা আমাকে কী করল জানো? আমার ওপর আক্রমণ করে জামা-কাপড় ছিঁড়ে এর টুকরোগুলো গ্রামবাসীর মাঝে বিলিয়ে দিলো। তারা এর থেকে বরকত পাবে মনে করল। আমাকে তারা থাকতে বলল তাদের সাথে। আমি যখন জানালাম আমি নিজ দেশে ফিরে যেতে চাই, তখন তারা গ্রামের সব মেয়েকে নিয়ে এসে আমার কাছে বিয়ের জন্য উপস্থাপন করল। আমি রাজি হইনি। বললাম যে, আমার স্ত্রী-পুত্র আছে।'

ওসমান চাচা শ্বাস নেওয়ার জন্য আবার থামলেন। তারপর আবার খবর বর্ণনা করতে লাগলেন নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে। ইয়াসারের দিকে মাথা এগিয়ে দিয়ে

বললেন নিচু কণ্ঠে, 'জানো, এরপর তারা কী সিদ্ধান্ত নিল? তারা আমাকে হত্যা করতে চাইল!'

ইয়াসার চিৎকার করে বলল, 'আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছে! কেন? আপনি কি কোনো খারাপ ব্যবহার করেছেন?'

ওসমান মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না, তারা নাকি আমাকে সম্মান করবে— যেমনটা বলল। তারা যখন দেখতে পেল যে আমি তাদের কাছে থাকতে নারাজ; তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসল। তারা বলল, এই লোকটা বরকতপূর্ণ মানুষ; সে চলে গেলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরা। সবচেয়ে ভালো হবে যদি তাকে হত্যা করা যায় এবং তার কবরে একটা সুন্দর মাজার বানানো যায়। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের জন্য এবং আমাদের গ্রামের জন্য যুগে যুগে বরকতময় হয়ে থাকবেন।'

ওসমান চাচা তীব্র আবেগ নিয়ে বলল, 'আমি তাদেরকে কোনো সুযোগই দিলাম না। যে রাতে শুনলাম, তারা আমাকে হত্যা করবে সে রাতেই আমি পালালাম।'

ইয়াসার যখন মনোযোগ দিয়ে ওসমান চাচার বিস্ময়কর বর্ণনা শুনছে—ওসমান চাচা না হলে এ কথা বিশ্বাস করাই যেত না—তখন যেন ভেসে এল একটা গানের সুর, 'সে আমাদের চায় না'। সে অনিচ্ছায় দ্রুত পাশে তাকাল এবং তাকে দেখল। গোলাপি-মুখে সুন্দর মুচকি হাসি এবং দু-চোখে অভিযোগের চিহ্ন। মেয়েটা আগুন জ্বালিয়ে দিলো পবিত্র যুবক ইয়াসারের অন্তরে। তারপর নিজের দাসের দিকে ফিরল।

কী ব্যাপার? এ অসময়ে সে এল কেন? ইয়াসার তো সূর্য ওঠা পর্যন্ত বাসা থেকে বের হতে দেরি করেছে। সেও কি দেরি করেছে? কীভাবে আবার এ ঘটনা ঘটল?

সেদিনের মতো চলে গেল মেয়েটা। রাতে যখন ইয়াসার বাসায় ফিরছিল তখন ওসমান চাচার সাথে যেখানে দেখা হয়েছিল সে পথ দিয়েই হেঁটে আসছিল। তার মনে পড়ে গেল মেয়ের কথা। অন্তরটা একবার নড়ে উঠল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল সে। ইয়াসার যেন তার মিষ্টি স্বরে শুনতে পেল, সে আমাদেরকে চায় না..

ইয়াসার অন্ধকার সন্ধ্যায় নদীর দিকে চেয়ে রইল। মৃদু বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর পানি স্থির। কোনো মাঝি দেখা যাচ্ছে না যে বৈঠা বেয়ে গান গেয়ে সামনে অগ্রসর হবে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার মাথায় ভাবনার জোয়ার বইতে লাগল।

কীভাবে এই মেয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করল?

কীভাবে অতিসন্তর্পণে তার মনে জায়গা করে নিল?

তার পবিত্র অন্তরের সফেদ চাদরে যেন কালিমার ছাপ ফেলে দিলো এ মেয়েটা। আজ থেকে আর তার মাসজিদে যাওয়া বা শাইখের সামনে বসা মানাবে না। সে আর সেই পবিত্র শুদ্ধাচারী তরুণ নেই! কারণ আল্লাহর সাথে সংযুক্ত বান্দার অন্তরকে অবশ্যই যে-কোনো নারীর ছবি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। সেখানে এ ধরনের মেয়ে থাকতেই পারে না।

হায়, কীভাবে সে তার পবিত্র অন্তরকে অপবিত্র করে দেওয়ার সুযোগ দিলো! কীভাবে অনুমতি দিলো! সে যদি সুযোগ না দিত তা হলে ওই মেয়েও তার প্রতি আকৃষ্ট হত না। না! এভাবে চলতে দেয়া যায় না। এভাবে চলতে পারে না।

কালই সে যাবে। শাইখের কাছে সবকিছু খুলে বলবে। তার কাছে তো ওষুধ আছেই।

কেনই-বা সে শাইখকে বলবে না?

সে তো নিজের বাবাকে যা বলে না—সবচেয়ে কাছের মানুষকেও যা বলে না; তা শাইখকে বলে। সে শাইখকে নিজের বাবা, বড় ভাই, বন্ধুর চোখে দেখে। বরং তার থেকেও বেশি মনে করে। শাইখই তো তার মুরব্বী।

নদীতীরে অবস্থিত তার রুমে এসে দাঁড়িয়ে রইল ইয়সার। উপভোগ করতে লাগল জানালার ফাঁক গলে বয়ে আসা বাইরের ঝিরিঝিরি ঠান্ডা আবহাওয়া। খুব বেশি ঠান্ডা না। আবার বাইরে নদীর কাছে কিছু ফানুসের আলো চোখে পড়ছে। সে আকাশের দিকে চোখ ফেরাল। গভীর রাতে যেন এ বিশাল জগৎ সাজদাহ করছে। তাকালে সে তারকারাজির দিকে; যে তারকারাজি আকাশের পর্দাকে অলঙ্কৃত করে রেখেছে। সে বারবার বলতে লাগল, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!

এরপর আস্তে আস্তে জপতে লাগল। অনুভব করতে পারল তাসবীহের স্বাদ ও মিষ্টতা। উচ্চৈঃস্বরে পড়তে লাগল। ক্রমে উঁচু হতে লাগল আওয়াজ। এক সময় মনে হলো যেন এ বিশ্ব চরাচর তার তাসবীহের সাথে সমান তালে তাসবীহ জপে চলেছে।

সে জানে না দাঁড়িয়ে ছিল কতক্ষণ। তার মন মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বিশ্বের এ নীরব আহ্বান। এ আহ্বান তারই অন্তর থেকে বের হওয়া আর্তনাদের প্রতিধ্বনি। এরপর সে জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিলো। বিছানায় শরীরটা এলিয়ে পড়তে লাগল ঘুমের দুআ। দুআগুলোর অর্থে মশগুল হয়ে গেল। তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল প্রশান্তির ঘুম।

পথিকদের পথ

ফাজরের ওয়াক্ত হলে সামান্য আলোকিত হলো পূর্বাকাশ। ইয়াসার মুয়াজ্জিনের আযানের শব্দে জেগে উঠল ঘুম থেকে। মুয়াজ্জিনের আওয়াজের প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য বিছানায় শুয়েই মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল ইয়াসার। আযানের বাক্যগুলোতে যেন নতুন প্রভাববিস্তারকারী কিছু অর্থ খুঁজে পেল সে। সফলতা তো সব সময়ই সালাতের সাথে সম্পৃক্ত। যে সালাত আদায় করে না, সে সফল হতে পারে কী করে?

আযানের বাক্যের অর্থগুলো এই প্রশান্ত আওয়াজের সাথে তার বুকে স্থান করে নিল। তার রক্তে প্রবাহিত হয়ে শরীরে বয়ে গেল নতুন জীবনের একটা স্পন্দন। সে গভীর ঈমানের সাথে বলে উঠল :

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"সকল প্রশংসা তাঁর, যিনি আমাদের জীবিত করেছেন মৃত্যুর পর। আর তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" (মুসলিম, আস সহীহ : ৫০১৫)

আযান শেষ হওয়ার পর ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল ইয়াসার। দ্রুত ওযু করে জামাটা পরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফাজরের সালাতের পর মুসল্লীরা শাইখের চারদিকে গোল হয়ে বসে শুনতে লাগল তার আলোচনা। শাইখ আল্লাহর পথের পথিকদের পথচলা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। আঁধার রাতের পথিক পথ চলতে যেমন উজ্জ্বল তারকার সাহায্য নিয়ে থাকে, তেমনিভাবে তিনিও তার অনুসারীদের কাছে তার কথাগুলো অর্থবহ ও

স্পষ্ট করার জন্য সুস্পষ্ট ও জ্বলজ্যান্ত উদাহরণের সাহায্য নিচ্ছিলেন। তার কথাগুলো ঊর্ধ্বাকাশের তারকারাজির মতো অন্তরের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে আর সবার অন্তরকে তাকওয়ার রঙে রঙিন করে তুলছে। তার কথার স্পর্শে মানব-অন্তর ধারণ করেছে ঝরনা-নিঃসৃত নিটোল স্বচ্ছ পানির মতো সজীব ও পরিশুদ্ধ রূপ।

তিনি আল্লাহর পথের পথিকদের একটা উদাহরণ পেশ করলেন : একদল লোক পাহাড়ে উঠতে চাইল। তাদের কেউ কেউ শুরুতেই পাহাড়ের বিশালতা দেখে পিছু হটল। তাদের ইচ্ছাশক্তি প্রথমেই ক্ষয়ে গেল। আরেক দল লোক এক-চতুর্থাংশ যেতে-না-যেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কেউ কেউ অর্ধেক পৌঁছল। কিন্তু হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। আবার উঠে দাঁড়িয়ে নতুন করে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। হয়তো একটু পরেই তার হিম্মত ফুরিয়ে যাবে। সে যেখানে হোঁচট খেয়েছিল সর্বোচ্চ সেখানেই যেতে পারবে। সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সেই—যে চূড়ায় আরোহণ করতে পারবে।

শাইখ কথা বলছিলেন। চারিদিকে মানুষও পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল তার কথাগুলো। কেউ কেউ নিজ স্লেটে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো টুকে রাখছিল; যেন শাইখের আলোচনা ভুলে না যায়। কেউ কেউ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজ অবস্থার সাথে শাইখের কথাগুলো তুলনা করছিল।

শাইখের কথার প্রভাব আরও বেশি পড়ার কারণ শাইখের অন্তর ও বাহির একই। তিনি পূত-পবিত্র, অনেক বেশি ইবাদাত করেন, বেশি সাওম পালন করেন, রাত জেগে সালাত আদায় করেন, সর্বাবস্থায়-সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ করেন, সব সময় আল্লাহর দিকেই ফিরে আসেন আর আল্লাহর দণ্ডবিধি, সীমারেখা ও আদেশ মানার ব্যাপারে তিনি খুবই সজাগ। তার এই মহৎ অন্তর জ্ঞান অর্জন করে তৃপ্ত হতে পারে না আবার জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত থাকতেও ক্লান্তি অনুভব করে না। একইসাথে তিনি অন্তরের পরিশুদ্ধতা বজায় রাখেন, ইবাদাত-বন্দেগি করেন, আবার খাদ্য-বস্ত্রেও মধ্যমপন্থা অনুসরণ করেন।

নিজের অবস্থা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়াসার। সে জানে না যে কতদূর যাওয়ার পর মেয়েটা তার পথরোধ করে দিয়েছে। সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে মেয়েটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে সামনে অগ্রসর হতে।

শাইখের দিকে কাকুতিভরা চোখে তাকাল সে। কথা বলতে চাইল।

কী ক্ষতি হবে যদি উপস্থিত সবাই শুনে ফেলে।

না...।

আবূ আনাসের ঠাট্টা থেকে সে বাঁচতে পারবে না। ছেলেটা হাসি-তামাশা করতে পছন্দ করে। মাঝে মধ্যে তাকে উদ্দেশ্য করেই ঠাট্টা করে।

শাইখ কি তার মনের কথা বুঝতে পারেন?

একবার তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, ইয়াসার, আল্লাহকে ভয় করো। সেদিন এক প্রতিবেশীর মেয়ের দিকে চোরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ইয়াসার।

একটা মাত্র দৃষ্টি।

একটাই..।

আর আজ সে ইয়াসার এক গায়িকার কাছে পরাজিত।

ভাবনায় এত দূর পৌঁছানোর পর সে ঠোঁট কামড়াল।

আহ, যদি মেয়েটি পবিত্রা হতো, তা হলে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে এক মুহূর্তও দেরি হত না। কিন্তু...

সবাই যখন প্রস্থান করছে তখন চেতনা ফিরে এল তার। আবূ আনাস ফাদেল ইবনু আনাস তার কাঁধে হাত রেখে বলল, শাইখ, উঠেন-উঠেন। শাইখ তার আলোচনা শেষ করেছেন। ইয়াসার তখনও বিচরণ করছিল ভাবনার জগতে। শাইখ ইয়াসারের হাত চেপে ধরলেন। ইয়াসার শাইখের সাথে চোখাচোখি হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চোখটা নিচে নামিয়ে রাখলেন; পাছে শাইখ তার মনের খবর জেনে যায়!

শাইখ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না সে কী চায়!

কেন জিজ্ঞাসা করলেন না?

তিনি কি আশঙ্কা করেছেন যে, কেউ তা শুনে ফেলবে?!

ইয়াসার বাসায় চলে আসল ভারী পদক্ষেপে। বাইরের পরিবেশটা বেশ ঠান্ডা। বাতাসও জোরে প্রবাহিত হচ্ছে। আকাশে দেখা যাচ্ছে টুকরো টুকরো মেঘ। দুনিয়া যেন তার সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ করে দিয়েছে। অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। বয়ে যাওয়া বাতাসের মৃদু ধাক্কায় মাটিতে ঝরে পড়ছে গাছের শুকনো পাতাগুলো।

সে ঢেউ তোলা নদীর দিকে তাকালো না। চারদিকে সারি সারি বাড়ির দিকেও তাকালে না। কিছু মানুষ রিজিকের সন্ধানে গৃহ ত্যাগ করছে। তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না সে।

কিছুই দেখল না।

নিজেকে শুধু ধিক্কার দিতে লাগল।

নিন্দা করতে লাগল।

ছি! যে সব যুবক আল্লাহর আনুগত্যেই একত্র হয় ও বিচ্ছিন্ন হয় তাদের মাঝে সে কীভাবে ছিল!

সে কি তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে?!

কিন্তু সে তো কাউকেই ধোঁকা দিতে চায় না।

তাদের কাছে তার চরিত্র গোপন থাকলেও আল্লাহর কাছে কি গোপন থাকবে?

যেই আল্লাহ মনের খবর জানেন; চোখের চোরা দৃষ্টি সম্পর্কেও জানেন।

ইয়াসারের গাল-দুটিতে যেন নেমে এল কান্নার জোয়ার। হায়, সে একটা মেয়ের সামনে টিকতে পারছে না?

একটা মেয়ে!

শব্দটা সে উচ্চারণ করল তীব্র ঘৃণার সাথে।

ঘরে পৌঁছনোর পর কুরআনের দিকে ছুটে গেল। কুরআন পড়তে গিয়ে মনে হলো অশ্রুতে গাল সিক্ত হয়ে যাচ্ছে। আযাব-সংক্রান্ত আয়াতগুলো বারবার পড়ে সে কেঁদেকেটে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। কুরআন পড়া শেষ করলে তার মা এসে বললেন, 'বাবা ইয়াসার! কী হলো তোমার? এভাবে পড়ছ কেন?'

ইয়াসার তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার অশ্রুসিক্ত চোখের পাতায় তখনও অশ্রুবিন্দু জ্বলজ্বল করছে। তার মা বললেন, 'তুমি কাঁদছ!'

কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'বাবা, আল্লাহর ভয়ে ভীতদের পড়া এমন হলে তো চলবে না।'

এই মা কীভাবে জানবেন ইয়াসারের অন্তরে কী ঘটে যাচ্ছে। হায়, যদি তিনি বুঝতেন! তা হলে কি তিনি সাহায্য করতে পারতেন? ইয়াসার তো তার হৃদয়ের জন্যই ভয় পাচ্ছে। যে হৃদয়কে সে বছরের-পর-বছর ধরে গলিয়ে আল্লাহর দিকে সমস্ত ভালোবাসা-আকুলতা নিয়ে হাজির করেছে। আল্লাহ তার সত্যবাদী, সৎকর্মশীল ও মুমিন বান্দাদের জন্য যা প্রস্তুত করেছেন তা পাওয়ার আশায় যে হৃদয় ব্যাকুল।

কীভাবে এই মেয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করল?

তার জীবনে কোন দিক থেকে 'তার' অনুপ্রবেশ!

তার শুভ্র-সফেদ অন্তরকে বিনষ্ট করতে কোন দরজা দিয়ে এই মেয়ের আগমন?

ইয়াসার যখন দুপুরের খাবার খেতে দস্তরখানার সামনে বসে আছে তখন তার বোনের অদ্ভুত চাউনি খেয়ালই করেনি। বোন সানা তার দিকে চেয়ে আছে ভীত চড়ুই পাখির মতো। সানার কথাগুলো সে শুনতেই পেল না। সানা বলছিল, 'আপনি কি অসুস্থ?'

কথার জবাব না পেয়ে সানা তার হাতে হাত রেখে শরীরের তাপমাত্রা বোঝার চেষ্টা করল। ইয়াসার তাকিয়ে বলল, 'সানা, কী হলো তোমার?'

সানা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি অসুস্থ, ভাইজান?'

ইয়াসার দুঃখভরা মুখে মুচকি হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বলল, 'না রে বোন।'

সানা বারবার প্রশ্ন করলে ইয়াসার বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কি চুপ করবে না?'

সানাও একরোখা। সে তার চামচ দিয়ে বাটিতে আঘাত করল সজোরে। টুং শব্দের সাথে তার হাসির শব্দ ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। সে মুক্তাদানার মতো দাঁতগুলো বের করে বলল, 'উঁহু, আমি চুপ করব না।'

এবার তার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল ইয়াসার; যেন সে খারাপ কাজ করে ফেলেছে। তাকে বলল, 'তোমার সমস্যাটা কী? চুপ করছ না কেন?'

সানা শিশুসুলভ সরলতায় হেসে বলল, 'আপনি কি অসুস্থ?'

ইয়াসার বলল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার কোথায় ব্যথা?'

'অন্তরে।'

ছোটো মাথাটা নাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সানা। তার চুলের খোপাটা কাঁধ থেকে ঘাড়ে নড়তে লাগল। সে বলল, 'আম্মু যেই ওষুধ ব্যবহার করে সেটা আমি নিয়ে আসছি আপনার জন্য।'

ইয়াসার তার হাত ধরে ফেলল। বলল, 'তুমি যে অর্থ বুঝেছ সে অর্থে ব্যথা করছে না।'

দু-চোখে নিষ্কলুষতা, সরলতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে গভীর স্নেহের সাথে বলল, 'তবে কীভাবে ব্যথা?'

সে তার কাছে স্পষ্ট করার জন্যে বলল, 'এই সামান্য ধুলা পড়েছে।'

সানা অট্টহাসি হেসে পিছনের দিকে ঝুঁকে তার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'ও তাই বুঝি! ধুলা আবার অন্তরে পৌঁছল কীভাবে? আমাকে বলুন তো।'

এবার ইয়াসার সানার হাত ছেড়ে দিয়ে তার সাথে হাসিতে যোগ দিলো। বড় বিড়ালটা ঘরের সর্বত্র হেঁটে বেড়াচ্ছে আর মিউ মিউ করছে। তার মা যথারীতি খাবার প্রস্তুত করতে লাগলেন। তিনি খাবারের থালাবাসনগুলো সাজালেন। খাবার প্রস্তুত হওয়ার পর ইশারা করলেন সানার দিকে। খাবারের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، بِسْمِ اللهِ

"হে আল্লাহ! আমাদের রিযকে বরকত দিন আর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচান। আল্লাহর নামে শুরু করছি।" (তিরমিযি, আস সুনান : ৩৪৫৮)
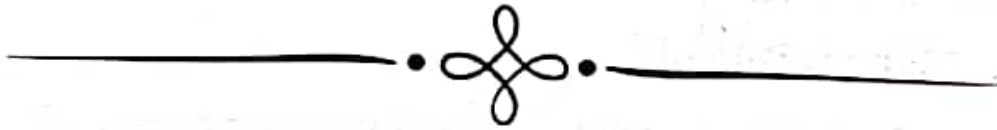
মেয়ের গৃহে

ইয়াসার তার বাবার দোকানে যেতে ওই মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ থেকে নিজেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে পথ পরিবর্তন করা ছাড়া কোনো উপায় দেখল না। সে বিপরীত রাস্তা ধরে এগোবে, যদিও রাস্তাটা বড়। এ রাস্তায় অবশ্য আগে যায়নি সে। কিন্তু.. কী আর করা!

সে চলতে লাগল ভিন্ন রাস্তা ধরেই। রাস্তায় চোখে পড়ল অনেক পরিচিত লোকজন। আবুল ফিদার সাথে দেখা হলো। আবুল ফিদা তার ছেলে ফিদাউদ্দীনকে ঘরের সামনে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছেলেটা প্রায় সুস্থ হওয়ার পথে। সে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে, হাত নাড়াচ্ছে আর ফুলের মতো মুখটা মাথাসমেত নাড়িয়ে দেখছে মানুষজনকে। চারিদিকে গাছপালা শীতের খোলস ত্যাগ করে বসন্তের রূপ ধারণ করা শুরু করেছে।

পথ চলতে থাকল ইয়াসার। নিজের পবিত্রতার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পোষণ করল। এই তো তিন দিন গেল; তার সাথে আর সাক্ষাৎ হওয়া লাগল না। কিন্তু তার চেহারাটা মানসপটে এখনও সজীব। তার কণ্ঠ যেন কানে ফিসফিস করে কিছু বলছে। এখনও সে কল্পনায় দেখতে পায় তার চোখ দুটি। কী বিষণ্ণ দুটি চোখ। প্রতিদিনই তার আকুলতা ও আগ্রহ বাড়তে লাগল। তার অন্তরে মেয়ের দখল করা জায়গাটা যেন আরও প্রসারিত হলো। কিন্তু সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে নিজের অন্তরের ক্ষতস্থানে ওষুধ দেওয়ার।

চতুর্থ দিন বিকেলে ইয়াসার এশার সালাতের পর কাজি শাইখ মুহাম্মাদ সালেহের

বাড়িতে গেল। ফিকহি মাসআলা, প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা, মজাদার কৌতুক, হাদীস-তারিখ-সাহিত্যের কিছু উদ্ধৃতি—সব মিলে সরস ছিল মজলিসটা। শাইখ তার আলোচনার ফাঁকে কিছু মজার মজার কথাও যোগ করছিলেন।

সেই বিকালটা দেরি হয়ে গেল। ইয়াসার বের হয়ে দেখল আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টি শরীরে লাগার ভয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা হল ইয়াসার। বাড়িতে যেতে মাত্র কয়েক পা বাকি; এমন সময় অন্ধকার প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এল কালো মধ্যম গড়নের একজন লোক। সে শান্ত স্বরে বলল, 'জনাব, আমার কথা শুনবেন কি?'

তার দিকে তাকাল ইয়াসার। তার মুখের আকৃতি দেখে চিনতে পারল। লোকটা ওই মেয়ের দাস—মুরীদ। সে আবার বলে উঠল, 'আমার মালকিন অসুস্থ। আপনাকে দেখতে চাচ্ছেন।'

ইয়াসার ভেবেছিল চূড়ান্ত নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে সে। আর এ পথে সে বাধা হবে না। কিন্তু তার দাস মুরীদ হাজির হলো। আবার তার কথা মনে করিয়ে দিলো। তার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইয়াসার রেগেমেগে বলল, 'আমার সামনে থেকে সরে যাও।'

মুরীদ সেখানেই দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে বলল, 'জনাব, তিনি অসুস্থ।'

ইয়াসার বলল, 'এই ব্যাটা! তার অসুস্থতায় আমার কী আসে-যায়?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলল, 'তার জন্য ডাক্তার ডাকো।'

মুরীদ সত্য কথাই বলল, 'ডাক্তারকে বাড়িতে পেলাম না। তাই তিনি আপনাকে ডেকে পাঠাতে বললেন।'

ইয়াসার তার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকালে মুরীদ বলে গেল, 'জনাব, মনে হয় আপনাকে তিনি গোপনে কিছু বলতে চান।'

ইয়াসার হাত তুলে দরজায় কড়াঘাত করতে উদ্যত হতে গিয়ে বলল, 'তার পরিচিত কারও কাছে গোপন কথা বলুক।'

দাসটা এক পা পিছিয়ে বলল, 'কিন্তু তিনি যে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করেন না।'

ইয়াসার তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বলল, 'সে আমাকে চিনে কীভাবে?'

দাস জোরের সাথে উত্তর দিলো, 'আপনাকে চিনে না এমন মানুষ আছে! বাগদাদ

শহরে এমন কে আছে, যে ইয়াসারকে চিনে না!'

ইয়াসারকে চুপ করে থাকতে দেখে মুরীদ বলে চলল, 'জনাব! তিনি শোচনীয় অবস্থায় আছেন। যদি তাকে একবার দেখতেন তা হলে আপনার অন্তরটা নরম হয়ে যেত। কে জানে, হয়তো তিনি বাঁচবেন না আগামীকাল পর্যন্ত!'

এ সময় আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। শেষ কথাটা তার অন্তরে আঘাত করল। সে বলেই ফেলল, 'কালকে পর্যন্তও বাঁচবেন না!'

দাসটা মাথা নেড়ে বলল, 'জীবন-মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে।'

ইয়াসার বলল, 'তোমার কী মনে হয়? তিনি কী চান?'

দাস নিচের দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'হয়তো তিনি তাওবা করতে চান।'

ইয়াসার অবিশ্বাসের সাথে বিড়বিড় করে বলল, 'কী তাকে তাওবা করতে বাধা দিয়েছে? আল্লাহ তো তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন আর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।'

দাস মাথা তুলল। তার চুলে বৃষ্টির পানি। সে বলল, 'সম্ভবত তিনি আপনাকে গোপনে কিছু বলতে চান।'

বেড়ে গেল ইয়াসারের হৃদকম্পন। সে ঠোঁট নাড়িয়ে বলল, 'গোপনে?'

ইয়াসারের মনে হলো সে ওই লোকের মতো যাকে স্রোতের মুখে সাঁতার কাটতে দেওয়া হয়েছে। সে সাঁতার কাটতে গিয়ে হয়ে পড়েছে ক্লান্ত-শ্রান্ত। অনেক চেষ্টা করছে তীরে পৌঁছুতে। কিন্তু সাগরের ঢেউগুলো তাকে অনিচ্ছায় স্রোতের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তীরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না। কিছু একটা ইয়সারকে বাধ্য করল মেয়েটাকে দেখতে যেতে রাজি হতে।

রাস্তায় যাওয়ার পথে দাস বলল, 'আপনি আমাকে একবার বলেছিলেন—আল্লাহকে ভয় করো আর পাপাচার থেকে বিরত থাকো।'

ইয়াসার দাসের দিকে ফিরে তার কথার সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখভঙ্গি থেকে বুঝতে পারল না কিছুই। তার গলার স্বর অন্ধকারাচ্ছন্ন যা মুখভঙ্গি থেকেও আরও স্পষ্টভাবে তার কথাকে জানান দিলো। আকাশের গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির পানি পৃথিবীর বুকে সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে অনবরত। ইয়াসার কয়েক পা হাঁটার পর বলল, 'তুমি যে কাজে জড়িত, তা ত্যাগ করো।'

দাস তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে যোগ করল, 'আল্লাহর যমীন প্রশস্ত।'

আকাশ থেকে পড়তে-থাকা বৃষ্টির ছটার বিপরীতে রাস্তার চারদিকের বাতিগুলো যেন ছোট্ট বালকের মতো মুচকি হাসছে। আবার কিছু বাতি যেন ভয়ে নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে; বিশেষত শীতকালের শেষের দিকের এই সময়টায়।

তারা মেয়ের ঘরে কাছে আসার পর ইয়াসার বলল, 'তুমি আমাকে একা রেখে যেয়ো না।'

দাস তার কথা পুরোপুরি বুঝল না। ইয়াসার বলল, 'অপরিচিত (গায়র মাহরাম) নারীর সাথে নির্জনে থাকা একজন পুরুষের জন্য বৈধ নয়।'

যে রুমে মেয়েটি শুয়ে আছে সেই রুমের দরজাটা খুলে দেওয়ার সাথে সাথে ইয়াসারের নাকে এসে লাগল মিস্‌কের সুঘ্রাণ। রুমটা দামি আসবাবপত্রে চকচক করছে। রুমের মাঝে একটা দামি পালঙ্ক। তার ওপরের দিকে ঝুলছে দুটো বাতি। এই বাতি দুটো হাকীম ইবনু মাহমূদ ফ্রান্সে সর্বশেষ সফরে গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে এসেছে। মেয়েটা শুয়ে আছে ওই পালঙ্কের ওপর। তার শরীর সাদা নকশাকৃত চাদরে বুক পর্যন্ত আবৃত করা। তার লম্বা কালো কেশগুচ্ছ সে বুকের ওপর এলিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটি ব্যথায় কোঁ কোঁ করছিল। ইয়াসার রুমে ঢোকার পর-পরই তার দু-পা জমে গিয়েছিল। নিজেকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু তার এই দ্বিধা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। মেয়ে তার কাকুতিভরা দু-চোখে দৃষ্টিপাত করল ইয়াসারের দিকে। ইয়াসারের অন্তরটা ধক করে কেঁপে উঠল। জাদুগ্রস্তের মতো তার দিকে এগোতে লাগল ইয়াসার। মনে হলো যেন সে স্বপ্নের জগতে আছে। তার কাছে চলে আসার পর নিচু স্বরে বলল, 'সারশীর...'

তার ডাকের উত্তর এল দু-চোখে। মেয়ে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। তার গলার সুমিষ্ট-স্বরে কান পাতছে। লম্বা চিকচিক করতে থাকা কালো চুল বুকের ওপর এলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুকের ধুঁকপুকানি বারবার উঠছে আর নামছে। ইয়াসার ঘুমন্তের মতো বলল, 'সারশীর, তোমার কী অবস্থা?'

সারশীর অশ্রুধারা সংযত করে অনেক কষ্টে মুচকি হেসে আর্তনাদ করে উঠল, 'আমি ভয় পেয়েছিলাম যে আপনার জিহ্বায় আমার নাম শোনার আগেই আমি মারা যাব।'

ইয়াসারও মন্ত্রমুগ্ধের মতো জবাব দিলো, 'সারশীর...'

মেয়েটি যেন ভুলেই গেল যে অসুস্থ। সে বলে উঠল, 'ইয়াসার...'

ইয়াসার বলল, 'তুমি আমার অন্তরজুড়ে আছো সারশীর!'

সারশীরের গালে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তার মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'ইয়াসার... আমি...'

ইয়াসার আবার বলল, 'তুমি আমার পুরো অন্তর জুড়ে আছ!'

তার কথা শুনে সারশীর হারিয়ে গেল আনন্দের জগতে। সে নড়াচড়া করে বসার চেষ্টা করতেই ব্যথা আবার ফিরে এল তার শরীরে। সে কোঁকড়াতে লাগল ব্যথায়। চিৎকার করে উঠল। ইয়াসার তার দিকে তাকিয়েই ছিল। ইয়াসারের মন যেন তার ব্যথায় ব্যথিত হচ্ছিল আর চাচ্ছিল যেন এ ব্যথা মুছে যায়।

রুমের দেয়াল গোলাপি রঙে আচ্ছাদিত। খাটের ওপর থেকে ঝুলছে দুটো বাতি। বাতির আলোতে রুমটা ঝকমক করছে। রুমের একপাশে চীনা চুলাটা রুমে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার ব্যথা কিছুটা কমার পর আফসোসের স্বরে বলল, 'আমি...'

ইয়াসার তার দিকে তাকাল। তার লাল ঠোঁট দুটো থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায় রইল। জ্বরের প্রভাবে তার কপালে জমেছে ঘামবিন্দু। তার দিকে তাকিয়ে তার কথা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল। কিন্তু সে কেঁদে ফেলল। চোখ বেয়ে ঝরনার মতো অশ্রুপাত হতে লাগল।

সে চাইল তাকে সবকিছু জানাতে। তারপর তার কাছে ক্ষমা চাইতে। সে চেয়েছিল তাকে বলতে যে, এই আলোকিত তরুণ এই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে তা সে ভাবতেই পারেনি। যে তরুণ এক পথে চললে শয়তান অন্য পথে হাঁটে তার এ পরিণতি কল্পনাও করতে পারেনি সে।

তার চারিদিকে কত মানুষ এসে পরাজিত হয়েছে!

তারা তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছিল।

তারা মনে মনে তার থেকে একটা দৃষ্টি, একটা মুচকি হাসি, একটা কথা আশা করেছিল।

সে একটা কথা বললেই তা শোনার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে যেত!

আর এই পরহেজগার ছেলেটা!

সারশীর আবার তার সুন্দর শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারার দিকে তাকাল। তার চেহারায়

দাড়ি তাকে করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয় ও সুন্দর। তার আলোকিত মনকাড়া দু-চোখ থেকে সে সুমিষ্ট মধু পান করতে লাগল। ইয়াসার তখনও তার দুই লাল ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে তার কথা শোনার অপেক্ষায় ছিল। তাকে বলল, 'সারশীর, তুমি কাঁদছ!'

সারশীর তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি মৃত্যুকে ভয় পাই।'

ইয়াসার অজ্ঞাতসারেই বলল, 'আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করুন। তোমার স্বাস্থ্য তো ঠিকই আছে।'

সারশীর তার ভীত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি চান আমি বাঁচি?'

ইয়াসার বলল, 'এ তো আল্লাহর ইচ্ছা।'

ঈমানদীপ্ত ও তাকওয়াভরা কণ্ঠে আরও বলল, 'জীবন তো আর আমাদের হাতে না। আল্লাহই এর মালিক।'

সে ব্যথিত হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি যে গুনাহর বোঝা নিয়ে আছি!'

ইয়াসার ব্যথিত অন্তরের থেকে বলে উঠল, 'আল্লাহর কাছে তাওবা করো। আল্লাহর কাছেই চাও যেন তিনি তোমাকে মাফ করে দেন।'

তার দিকে কাকুতিভরা চোখে তাকিয়ে সারশীর বলল, 'ইয়াসার, আপনি কেন আমার জন্য দুআ করেন না? আপনার দুআ তো আল্লাহ কবুল করেন।'

ইয়াসার মাথা নাড়িয়ে বুজুর্গের মতো উত্তর দিলো, 'আল্লাহ বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন।'

সারশীর মাথাটা অন্যদিকে ফেরাল। কাঁদতে লাগল নিঃশব্দে। তার গাল দুটো অশ্রুসিক্ত দেখে ইয়াসারের অন্তরের সকল তালা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সবগুলো দরজা খুলে গেল একসাথে। ইয়াসার এবার চিৎকার করে বলল, সারশীর..

অনুনয়-বিনয় করে বলল, 'প্রিয়তমা, চোখের পানি মুছে ফেলো। আমার হৃদয়ের প্রতি রহম করো।'

সারশীর তার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি আমাকে ভালোবাসেন। তাই নয় কি?'

আরেকবার নিজের অন্তরের সব কথা খুলে বলতে তার ইচ্ছা হলো। কিন্তু মুখ খোলার সাথে সাথেই তার দাস একটা পাত্রে ওষুধ নিয়ে হাজির হলো—'এই ওষুধটা

কাজে দিবে, মালকিন।'

সে তখনও ইয়াসারের দিকে তাকিয়ে আছে। দ্রুত দাসের হাত থেকে ওষুধ নিয়ে বিছানায় সোজা হয়ে বসল। মনে চাইল যদি ইয়াসার নিজ হাতে খাইয়ে দিত!

ইয়াসার পাত্রটা এগিয়ে দিলো। সারশীরের হাত বাড়ানোর অপেক্ষায় রইল। তাকে বলল, এই নাও। আল্লাহর নামে পান করে নাও, যিনি মানুষকে সুস্থ করেন। আল্লাহর নামে খাও, যে নামের সাথে আসমান-যমীনে কোনো ক্ষতি হয় না। আর তিনি সবকিছু শোনেন। সবকিছুই দেখেন।

সারশীর পাত্রটা হাতে নিল। সব ওষুধ গিলে নিল কয়েক ঢোকে। তারপর কিছুক্ষণ মাথা উঁচু করে ঘরের দেয়ালের কোণে একটা অস্পষ্ট নকশা দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবার গা এলিয়ে নিজেকে আবৃত করে নিল চাদরে। তার বুকটা ওঠা-নামা করতে লাগল। সে কিছু সময় মৃদু ব্যথার আওয়াজ করল। তারপর তার বুক ধড়ফড় করা কমল এবং সে ঘুমিয়ে গেল।

ইয়াসার তার দিকে স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর দাসের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল, 'কবে থেকে তার এ অবস্থা?'

দাসকে বাতির সামান্য আলোতেও কুচকুচে কালো লাগছিল। সে উত্তর দিলো, 'দুই দিন ধরে জনাব।'

মাথা নাড়িয়ে আরও বলল, 'এই প্রথমবার আপনার হাত থেকে তিনি ওষুধ পান করলেন।'

মুরীদ কিছুক্ষণের জন্য চুপ থেকে বলল, 'তিনি সব সময় আপনাকে ডেকে আনার জন্য চাপ দিতেন। প্রথম দিন অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তিনি বলতে লাগলেন, তাকে সব জানতেই হবে। আমি তাকে সবকিছু খুলে বলব।'

ইয়াসার উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আমি আগামীকাল আবার আসব ইন শা আল্লাহ।'
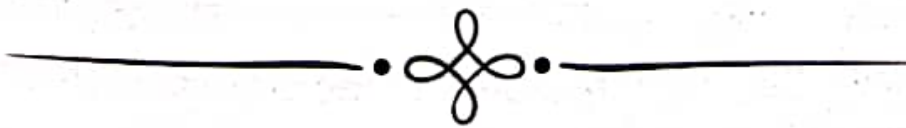
আমি সিয়ামরত

শাইখ আবুল ইরফান যেমনটা বলেছিলেন তেমনভাবে সব তালা খুলে যায়নি। কারণ ইয়াসার বীরদের মতো লড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কীভাবে সে টিকবে! সে যে নারীদের কূটকৌশলের মুখোমুখি আগে হয়নি!

যে মাসজিদে ইয়াসার ফাজরের সালাত আদায় করত, সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিলো সে। শাইখের আলোচনায় সে আর বসে না। তাকে বশ করে ফেলেছে হাকীম ইবনু মাহমূদ। তার কানে বিভিন্ন গাল-গল্প, কল্পনা ঢেলে দিয়েছে। এগুলো তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করায় না বরং অন্তরকে কঠিন করে দেয়। এই হাকীম এক ধান্ধাবাজ প্রতারক। সে খুবই চতুর ও ধুরন্ধর। তার এই ভণ্ডামিতে সে এত মজা পায়, যা কোথাও সে পায় না। তার এই অপকর্মের মাধ্যমে সে সাঈদকে বাড়িতে টেনে এনে নিজের দলে ভিড়িয়েছে।

সাঈদ এক ইলমওয়ালা ও তাকওয়াবান পরিবারে বড় হয়েছে। তার উত্তম চরিত্র মানুষের কাছে আদর্শ ছিল। দুই বছর আগে তার একটা অসুখ হলো। এই অসুখে সে কয়েক মাস শয্যাশায়ী ছিল। এ সুযোগে হাকীম তার কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগল। তার সাথে গড়ে তুলল সুসম্পর্ক। তাকে নষ্ট ও খারাপ বিভিন্ন গল্প শোনালো। ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় হলো। সাঈদের সাথে গভীর হয়ে উঠল হাকীমের সম্পর্কটা। বিছানা ছেড়ে ওঠার পর থেকে সাঈদ শুধু হাকীমের সাথেই বের হয়। তার সাথে চলাফেরাতেই শুধু শান্তি খুঁজে পায়।

আবুল হাসান আল-ওয়াররাক বলেন, আমার ধারণা এবং সেটা সত্যিই যে—

তার সাথে সাঈদ বেশি দিন থাকতে পারবে না। এমন একদিন আসবে যেদিন সে ঘরের দিকে ফিরে আসবে। তার বাবা তার জন্য যে অসিয়ত রেখে গেছে তার দিকে সে এখনও ফিরেও তাকায়নি।

ইয়াসার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে মেয়ের বাড়িতে যায়নি। কারণ সেদিন সে ঘুম থেকে উঠল সকালে ফাজরের অনেক পরে। সূর্যোদয়ের আগেই সে সালাত আদায় করল। নিজের ঈমানের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পারল সে। নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল বারবার।

এই মেয়ে কি তবে ধোঁকা দিলো?

হয়তো তাই, খুব সম্ভব তাই-ই হবে।

কিন্তু তাকে যে কাঁদতে দেখেছে সে! মেয়েটা যে ব্যথায় কাতরাচ্ছিল!

ব্যথায় সে কোঁকাচ্ছিল!

তার দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছিল।

ইয়াসারের মনে হলো সেই মেয়েটা তার সামনে উপস্থিত হয়ে যেন বলছে, আপনি কি চান আমি বাঁচি?

আকুতিভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে, আপনি আমাকে ভালোবাসেন। তাই নয় কি?

নিশ্চয় সে অনেক তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। তা হলে কি এই মেয়ের দ্বারা তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে?

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ঘটনাটা তার দু-চোখের সামনে দেখা দিলো; যেমনটা সে শাইখের মুখ থেকে শুনেছে। পরিপূর্ণ শক্তি ও সৌন্দর্যের অধিকারী এক যুবক ছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম।

তাকে ডেকেছিল এক নারী। যে নারী সম্মানিতা ও সুন্দরী।

কিন্তু তিনি পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন, না।

কুরআন তার এই অবস্থানকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে আলোকিত হরফে। কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আগত সকল প্রজন্ম এটা পাঠ করেছে, করবে। যখনই এ ধরনের কোনো ঘটনা আবার ঘটে তখন তারা এর আলোকে জীবন পরিচালনা করতে পারবে।

إنه من عبادنا المخلصين

“নিশ্চয় সে আমাদের একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা ইউসুফ : ২৪)

ইয়াসার ব্যথায় ও কষ্টে চিৎকার করে বলল, আমি কী করে একনিষ্ঠতার মাকামে পৌঁছব!

কীভাবে ইউসুফ ধৈর্য ধরেছিলেন!

সবকিছুই তার কাছে কামনা করেছিল। চারদিকের দেয়াল, বন্ধ দরজা, আসক্ত নারী যে তার সর্বস্ব দিয়ে দিতে চায়—এরা সবাই তার কাছে কাকুতি করছিল, তার কাছে চাইছিল।

কিন্তু তিনি বলে দিলেন, না।

এত ঈমানী শক্তি কীভাবে ছিল তার?

নিশ্চয় তার অন্তরে যে শক্তি ছিল তা যে-কোনো নারী সকল সৌন্দর্য, কূটকৌশল ও চক্রান্ত নিয়ে হাজির হলেও তাকে টলাতে পারত না এবং তার ক্ষতি করতে পারত না! ইউসুফ তার অন্তরকে মুছে ফেলেছেন এই নারী থেকে। আর এক নতুন আলোয় তার অন্তরকে ভরে দিয়েছেন। যে আলোর উৎস আসমানে। তিনি যে আসমানেই উঠে চলেছেন। তিনি যমীনে ততটুকুই নামেন, যতটুকু তাকে উঠতে সহায়তা করে।

ইয়াসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিলাওয়াত করল,

مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ এমন মুহসিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।” (সূরা ইউসুফ : ৯০)

মুমিন ধনাঢ্য-দারিদ্র্য, অসুস্থতা, কারাগার—সবকিছুর দ্বারাই পরীক্ষিত হয়।

কিন্তু এ কেমন পরীক্ষা!

আমার রব!

আমি যে আর পারছি না। আর পারছি না আমার রব!

একদিন যায়। দুদিন যায়। এভাবে দিনের পর দিন যায়। একদিন আসরের পর ইয়াসার ভাবল কবরস্থানে গিয়ে দেখি; আখিরাতের পথচলায় কবরের নীরবতা থেকে কোনো শিক্ষা নেওয়া যায় কি না।

কীভাবে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এত উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছেন?

তার মনে পড়ে, একবার সে কবরস্থানে গিয়ে কবরে যা লেখা আছে সেগুলো পড়েছিল। সেই দেখতে যাওয়া তার ভেতরে তৈরি করে দিয়েছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ঈমানের একটা নবজাগরণ। তাকে পথ চলতে ও প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দিতে ঠেলে দিয়েছিল। বিশেষ করে সে যখন তার সাথির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে, এখানকার কবরস্থান যমীন থেকে উঁচু কেন?

আবুল হুসাইন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবিতার মতো করে বলেছিল, কত কবর আছে যেগুলো আবার কবর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সে কবিতার প্রথম লাইন বলে দ্বিতীয় লাইন আর বলেনি।

আজ ইয়াসার যাবে। হয়তো এই কবর যিয়ারত তার অন্তর থেকে মেয়ের ছবি মুছে দিবে।

মেয়েটা..

মেয়েটা..

অসুস্থ, রুগ্ন মেয়েটা ব্যথায় কোঁকাচ্ছিল আর কাতরাচ্ছিল।

মেয়েটার ছবি তার মানসপটে বারবার ভেসে উঠতে লাগল।

সে আর দাঁড়াতে পারছিল না। মেয়েটা যেন তার দিকে সুন্দর দুই চোখে তাকিয়ে সাহায্য চাইছে আর তার অন্তরের গহীন থেকে গাল বেয়ে পড়ছে এক বিন্দু অশ্রু।

সেই রাতটা তার পছন্দ হয়েছিল। রাতের সবকিছুই।

আকাশ থেকে পতিত বৃষ্টির ফোটাগুলো যেন ঘুমন্ত যমীনকে জাগিয়ে তুলছিল।

আর সেই দাস যে তাকে না নিয়ে যেতেই চাচ্ছিল না।

এমনকি রুমের দেয়াল, আন্দালুসিয়ার রাজকুমারীরা যে খাট ব্যবহার করত সেই খাট, আলোকিত বাতি, ওষুধের পাত্র—সবই তার ভালো লেগেছিল।

ভাবতে ভাবতে নিজেকে সে আবিষ্কার করল রুটির দোকানের শেষে ওই মেয়েটার বাড়ির সামনে। সময়টা তখন মাগরিবের কাছাকাছি। সে হাত বাড়িয়ে দরজার কড়া নাড়তে গেল। কিন্তু থেমে গেল। হাতটা নেমে আবার পাশে ফিরে এল। এরপর সে বিপরীত দিকে ঘুরল। যেদিক থেকে সে এসেছে আবার ফিরতে লাগল সেদিকেই।

কয়েক কদম গিয়েছে মাত্র।

ধীর ও ভারী পদক্ষেপ।

এরপর আবার দাঁড়িয়ে গেল।

অজানা কিছু একটা তাকে পিছন থেকে ডাকছে। মেয়েটার বাড়ির দিকে। সে আবার বাড়ির দিকে তাকাল।

এই তো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড নারকেল গাছ। এর ডালগুলো যেন সূর্যকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এগুলো আগে দেখেনি সে?

পাশেই পশমের তৈরি কিছু বল নিয়ে বাচ্চারা খেলছে। পা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে একে অপরের কাছে। একটা বাচ্চা মেয়ে সাদা রঙমিশ্রিত নীল জামা পরে আছে। সে তার মায়ের পাশে হাঁটছে। হাসছে অন্যান্য বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে।

অন্যদিকে একটা ফর্সা ছেলে জানালা দিয়ে একটা আপেল সুঁতায় বেঁধে ঝুলিয়ে দোল দিচ্ছে। সে এই খেলাতেই মজা পাচ্ছে।

আসমানটা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।

এই মহল্লার সবকিছুই দুই চোখে সুন্দর দেখায়। সবকিছুই পছন্দ করার মতো।

রাস্তার দুইপাশে সারি সারি বাড়ি।

বারান্দা থেকে ফুল বাইরে বেরিয়ে আছে।

রাস্তার শেষভাগে যে ফুলের দোকান।

মহল্লার বাচ্চারা।

লোকদের ফিসফিস করে কথা বলাটা।

মেয়ের বাড়িটা..

যে বাড়ির ভেতরে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা থাকে।

আবার ফিরে এল ইয়াসার। এবার দরজায় কড়া নাড়ার দৃঢ় সংকল্প নিল। স্বপ্নগুলো আবার জাগিয়ে তুলেছে তার অনুভূতিকে। তার আকর্ষণ বেড়ে গেছে। ইচ্ছেগুলো হয়েছে আরও তীব্র। সে আগ্রহী হয়ে আবার দরজায় কড়া নাড়তে উদ্যত হল।

তৃতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তার মনে পড়ল।

সর্বশেষ মাসজিদে উপস্থিত হয়ে শাইখের সাথে যে আলোচনা করেছিলেন সেটা মনে পড়ে গেল। তখন তার দুই চোখ আলোয় উদ্ভাসিত ছিল। তার দৃষ্টি অন্তরের গভীরে পৌঁছে যাচ্ছিল। শাইখ ইবরাহীমের ছেলে আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ আয-যাহাব,

আবুল হাসান আলি ইবনু হোসাইন, আবুদ, সালমান নাজদি-সহ সবাই তার বক্তব্য শুনছিল। ইয়াসার শাইখের সাথে চোখাচোখি হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখছিল যেন ধরা না পড়ে যায়।

তার মনে পড়ে গেল শাইখ আল্লাহর পথের পথিকদের যে উদাহরণ পেশ করেছিলেন তার কথা।

কে জানে তার অবস্থান এখন কোথায়?

সে কি পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে?

কোথায় পৌঁছেছে?

তবে তার যাত্রাপথ রুদ্ধ করে কি এই মেয়ের অবস্থান?

ইয়াসারের নিজের ওপর খুব রাগ হলো। নিজেকে এ পথে নিয়ে এসে সে নিজেকেই অপমানিত করেছে। তাই সে মেয়ের সাথে দেখা করার দৃঢ় সংকল্প করল। দেখা করে তার কথা শুনবে ইয়াসার। তার মুখের ওপর চিৎকার করে সে বলবে, আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

এভাবে তার থেকে মুক্ত হতে হবে।

দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হল।

দরজায় কড়া নাড়ল।

অপেক্ষা করল।

দীর্ঘ অপেক্ষা, কিন্তু দরজা খুলল না!

আরেকবার দরজায় আঘাত করে ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ শোনার অপেক্ষা করল। কিন্তু বাড়ির ছাদকে ছাড়িয়ে যাওয়া খেজুর গাছটার ওপরে বসে-থাকা চড়ুই পাখির কিচিরমিচির ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না। আবার উদ্যত হল কড়া নাড়তে।

মনে পড়ল, তিনবার কড়া নাড়ার অনুমতি আছে। ইতোমধ্যে দুইবার হয়ে গেছে। আরেকবার আছে। হাত তুলল সে।

মেয়েটা ইয়াসারকে আসার সময়ই দেখেছিল। সে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক গলে তার ইয়াসারের দিকে তাকিয়ে ছিল। তৃতীয়বার কড়া নাড়ার পর মেয়েটা অপেক্ষা করল। ইয়াসার যখন চলে যেতে লাগল তখন দরজাটা খুলে দিলো। তার

উজ্জ্বল কালো চুল কাঁধের ওপর বিস্তৃত, কাজল দেওয়া দুই চোখ, সরু নাক ও সুস্থ হওয়ার ফলে স্নিগ্ধতা ফিরে আসা মুখের প্রকাশ ঘটল।

মেয়ে তাকে এক মুচকি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল ; যে মুচকি হাসি তার শরীরের অঙ্গগুলোতে ঘটিয়ে দিলো বৈদ্যুতিক প্রবাহ। ফিসফিস আওয়াজে বলল, 'আসুন।'

না করার আগেই ইয়াসার দেখল সে দরজাটা খোলা রেখে ভেতরে অভ্যর্থনা কক্ষে চলে গেছে। সেও নিজেকে একটু পরে আবিষ্কার করল ওই কক্ষেই। মেয়ে খুবই নম্রভাবে তাকে বসতে বলল। এরপর চলে গেল রুম ছেড়ে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। তবে নিজের চুলে একটা সাদা গোলাপ রেখে। আর একটা লম্বা ট্রে-তে করে নিয়ে আসল এক গ্লাস বেদানার শরবত।

তার সামনে এসে নিজের ভাবনাগুলো ইয়াসার ভুলে গেল। শাইখের কথাও ভুলে গেল। সবকিছুই ভুলে গেল। শুধু বর্তমানই তার কাছে হয়ে গেল আসল। সে জানেও না কখন সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পাত্রের দিকে। পাত্রের রঙ আর ওই মেয়ের ঠোঁটের রঙ যে একেবারে একই! তার দিকে তাকিয়ে রইল জাদুগ্রস্তের মতো। হঠাৎ তার আওয়াজে চমকে উঠল যেন, আপনার শরবত পড়ে যাচ্ছে....।

তার হাতের গ্লাসটা কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিল। আরেকটু হলে শরবতটা কাপড়ের মধ্যেই পড়ত।

ইয়াসার আসার উদ্দেশ্য ভুলে গেল। শুধু ভাঙা কণ্ঠে নিম্নস্বরে বলল, 'কেমন আছেন?'

মেয়ে তার দু-চোখ ভেদ করে অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে বলল, 'আল-হামদুলিল্লাহ!'

'আপনি আগের থেকে ভালো অবস্থায় আছেন বলে মনে হচ্ছে। তাই না?'

তার চুলের গোলাপটা নড়ে উঠল। সে উত্তর দিলো, 'আপনার দয়ায় ভালো আছি।'

মেয়ের কানে ছিল মুক্তাখচিত কানের দুল। সেটাতে যেন ইয়াসার ফিসফিস করে বলল, 'সমস্ত দয়া আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।'

'আপনি আমাকে ওষুধ দিয়েছিলেন। আর এতেই আরোগ্য হয়েছিল।'—সহাস্যে উত্তর দিলো সে।

চোখ নামাল ইয়াসার। কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ রইল। প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে ইয়াসারের হৃদকম্পন। তারপর তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে বলল, 'আমি

আর পারছি না সারশীর।'

সে উত্তর দিলো, 'আমিও না। আমি এ শরবত আপনার জন্যই তৈরি করেছি।'

ইয়াসার স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে নিচু কণ্ঠে বলল, 'তুমি কীভাবে বুঝলে যে আমি আসব?'

সে তার আঙুল দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করে বলল, 'আমার অন্তর বলে দিয়েছে।'

ইয়াসার শরবত পান করার জন্য মুখের দিকে তুলল। দু-চোখের দীর্ঘ মিলন হল।

মেয়েটা চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'পান করুন। আমিই তৈরি করেছি। নিজ হাতে।'

সে হাত বাড়িয়ে দিলো। তাকে পান করাবে।

দুজনার মধ্যে খুব সামান্য দূরত্ব আছে। খুবই সামান্য।

ঠিক সে সময় মাগরিবের আযানের আওয়াজ ভেসে এল মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে।

আল্লাহু আকবার।

আল্লাহু আকবার।

ইয়াসার পাত্রটা ছুড়ে ফেলে দিলো। মনে হলো যেন সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। ইয়াসার উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি সিয়ামরত।'

সারশীর বলল, 'মাগরিবের আযান দিয়েছে তো।'

কিন্তু সে সুযোগ ইয়াসার দিলো না। দরজার দিকে ছুটে গিয়ে বলল, 'আমাকে যেতেই হবে।'

ইয়াসার বেরিয়ে গেল। তার সামনে দুনিয়াটা ঘুরপাক খাচ্ছে। তার দুই পা কীভাবে তাকে এই মেয়ের বাড়িতে এবার নিয়ে এল—সে বুঝে উঠতে পারছে না!

সেদিন থেকেই ইয়াসারের মাঝে পরিবর্তন এল।

সে আর আগের মতো নেই। সে আর সেই দুনিয়াবিমুখ আবেদ নেই—যে আবেদের জীবনের আঙিনা ইবাদাতে পরিপূর্ণ ছিল। আজ সে আঙিনায় জায়গা করে নিয়েছে রুটির দোকানের শেষে যে বাড়িটা রয়েছে সেটা।

পুরো দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করা যুবকটি আজ শুধুমাত্র একজোড়া ডাগর কালো

চোখের সামনে বারবার পরাজিত হচ্ছে।

শাইখ জাওয়াদ বলেন, একজন পুরুষ দুনিয়ার সব নারী থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু একজন নারী থাকে, যে তার অন্তরের মাঝে অতি গোপনে জায়গা করে নিতে পারে।

মেয়ের রহস্য

ইয়াসার বের হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মাঝেই সারশীর আবার ঘরের দরজায় জোরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনল। কড়া নাড়ার শব্দে ঘরটা কেঁপে উঠছিল। সে দ্রুত ছুটে গেল দরজা খুলতে।

দরজা খুলে সে দেখল ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘদেহী লোক। লোকটার নাক বেশ বড়। তাকিয়ে আছে ছোটো ছোটো দুই চোখে। মাথায় একটা পুরোনো পাগড়ি। নিজেকে তিনি মুসাফিরদের মতো একটা চাদর দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন। লোকটা উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'মুরীদ কোথায়?'

সে মেয়ের উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই বলল, 'তাকে বলে দিবেন যে কাফেলা আগামীকাল ফাজরের সালাতের পর বের হবে।'

লোকটা তার দিকে আর তাকাল না। উত্তর শোনারও চেষ্টা করল না। সোজা ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে গেল। কিন্তু মেয়ে পেছন থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'কাফেলা কোথায় যাবে?'

লোকটা দাঁড়াল না। ফিরেও তাকাল না। শুধু বলল, 'শামে।'

মেয়ে এ খবর শুনে চমকে গেল।

শামে!

মুরীদ শাম গিয়ে কী করবে!

সে কি তাকে না জানিয়ে একা একাই চলে যেতে চায়!

মুরীদ কি সেদিনের কথা ভুলে গেছে—যেদিন তাকে সারশীরের বাবা উদ্ভ্রান্ত আর বিতাড়িত ভবঘুরে হিসেবে পেয়ে নিয়ে এসেছিল।

সে তো বহু বছর আগের কথা।

সেসময় সারশীর ছোট্ট এক শিশু ছিল। বাড়ির বাগানে খেলছিল। এ সময় কালো একটা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন তার বাবা। পিছনে কৃষ্ণবর্ণের এক দুর্বল ছেলেকে বসিয়ে এনেছিলেন। ছেলেটার শরীরে সামান্য কিছু কাপড় দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকা ছিল। তাকে অপরিচিত ও ভয়ানক মনে হচ্ছিল। দু-চোখে ভয়ঙ্কর ঔজ্জ্বল্য। তাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সারশীর। চিৎকার করে ছুটে গিয়েছিল মায়ের কোলে। মা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, মামুনি আমার! ভয় পেয়ো না।

তারপর তার বাবা নামলেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। আদেশ দিলেন ছেলেটাকে গোসলখানায় নিয়ে যেতে। ছেলেটা প্রথমদিকে একটু বিদ্রোহ করে বসল। তিনি তার সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ছেলেটা বশ মেনে নিল। তাকে একটা সাদা চাদর পরিয়ে দিলেন। চাদরটাতে তাকে মানালো বেশ। তার জন্য একজন প্রশিক্ষক নিয়ে আসা হলো। যে তাকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখিয়ে দিলো। সারশীর দীর্ঘসময় তার ধারেকাছে যায়নি বা কথা বলেনি। সেও বড় বাগানের এক কোণে একা বসে থাকত। বাগানটা ছিল ফুলে সুশোভিত। এর প্রান্তে ছোটো ছোটো পাখিগুলো উড়ে বেড়াত। পানির হ্রদে কয়েকটা হাঁস খেলা করে বেড়াত।

কয়েকদিন না যেতেই ছেলেটার মাঝে এল ব্যাপক পরিবর্তন। সে এখন আর বস্ত্রহীন ভয়ঙ্কর চিকন ছেলে নেই। সে যখন খেত তখন সারশীর লুকিয়ে তাকে দেখত। সেও তার প্রশিক্ষকের কাছে পড়ার সময় উঁকি দিয়ে সারশীরকে দেখত। সারশীর মাঝে মাঝে পশমের বল বা আপেলের উচ্ছিষ্ট তার শরীরে নিক্ষেপ করত। সে বাঁকা চোখে তাকালে সারশীর গিয়ে আশ্রয় নিত মায়ের কোলে।

একদিন সাহস করে সারশীর তার কাছে গেল। তার সাথে কথা বলল। কিন্তু কোনো উত্তরই দিলো না ছেলেটি। নির্বিকার চিত্তে চেয়েই রইল। মনে হলো যেন দূরের সুন্দর ছোট্ট একটা পাখির দিকে সে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে আছে।

ছেলেটা আসার এক মাস যাওয়ার পর সারশীরের বাবা একদিন তাকে ইশারা করলেন। সে সুন্দর নতুন একটা জামা পরে তার পিছে পিছে চলল। বিকালবেলা তিনি ছেলেটাকে নিয়ে ফিরে এলেন। রাগে ফোঁস ফোঁস করছিলেন তিনি। অসতর্কভাবে কথা বলে যেতে লাগলেন, 'আমি জানি না সুলতান কীভাবে এই লোকটার ওপর

বিশ্বাস রাখে?'

সারশীরের মাকে উদ্দেশ্য করে বলে চললেন, 'মন্ত্রী মানদালী সুলতানকে বলেছে, এই দাসগুলো আপনার পাশে থাকা নিরাপদ না। আপনার প্রাসাদে এগুলো মানায় না।'

আমি সুলতানকে বললাম, 'আমি তার যিম্মাদার। আমি তাকে অন্য একজন ব্যক্তিতে পরিণত করব। আপনি যা চান তাই তাকে শিক্ষা দেবো।'

কিন্তু মূর্তিপূজক এই মন্ত্রী সুলতানকে রাজি করিয়ে ফেললেন। সুলতান আমাকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। সারশীরের বাবা রেগে-মেগে হাতে হাত চেপে বললেন, 'আমার এত পরিশ্রম বিফল হবে?'

সারশীরের মা ছিলেন তুর্কি। দেখতে বেশ ফর্সা আর অনেক সুন্দরীও। তিনি স্বামীকে মানানোর চেষ্টা করে বললেন, 'সে থাকার ফায়দা কী?'

বাবা বুকের মাঝে তপ্ত ব্যথা জমা রেখে বললেন, 'এই মন্ত্রীর ব্যাপারে আমার মনটা প্রশান্তি পায় না। সে একটা ধোঁকাবাজ। আমার ভয় হচ্ছে, সে এমন একটা চাল চালবে যে, আমাদের সুলতান, রাজত্ব সব কেড়ে নিবে।'

কিছুক্ষণ চুপ রইলেন সারশীরের বাবা। রাগ কমে গেলে দুঃখভরা কণ্ঠে বললেন, 'আমি তাকে সুলতানের খেদমতে পেশ করতে চেয়েছিলাম; যেন সে কাজে লাগে।'

সারশীর তখনও তার বাবার কথাগুলো বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে অনুভব করতে পেরেছিল যে ঘনিয়ে আসছে বিপদ। আর তার বাবা এই বিপদ থেকে সাবধান করে যাচ্ছেন ভারতবর্ষের সুলতানকে। কিন্তু সুলতান তার দিকে ফিরে চাইছেন না। একটুও গুরুত্ব দিচ্ছেন না তাকে।

তার বাবা কীভাবে সুলতানকে বোঝাতে সক্ষম হবে। তিনি তো পারেন শুধু গান। তিনি সুলতানের গায়ক। বিভিন্ন উৎসবে সুলতানকে আনন্দ দেওয়ার জন্য গান গেয়ে শোনান। প্রাসাদে যারাই যায় তাদের কাছেই তিনি খুবই প্রিয়, শুধু মন্ত্রীটা ছাড়া। মন্ত্রী তার উপস্থিতি সহ্যই করতে পারত না। যদি তিনি এত ভালো গান না পারতেন, তা হলে তাকে সহজেই প্রাসাদ থেকে দূর করে দিত।

সারশীরের বাবা যা ভাবলেন ঠিক তাই ঘটল। একবার প্রতিবছরের মতোই অভ্যাসবশত সুলতান শিকারে বের হলেন। এ সুযোগে রাজার আসনে বসে পড়ল মন্ত্রী মানদালী। হিন্দুয়ানী মূর্তিপূজক রাজাদের সাহায্য চাইলে তারও তাকে সাহায্য

করল। সে সুলতান মাহমূদ খিলজির কাছের লোকদের হত্যা, অত্যাচার ও কারাবন্দি করল। সারশীরের বাবাকেও হত্যা করা হলো। মা মারা গেল দুশ্চিন্তায়।

ছেলেটা বাস্তবায়ন করতে পারল মনিবের ওসিয়ত। সারশীরের বাবা সব সময় বলতেন—যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে তা হলে এই দেশে থাকবে না। সারশীর আর তার মাকে নিয়ে দেশত্যাগ করবে।

ছেলেটা গোপনে শহরত্যাগ করল সারশীরকে নিয়ে। সারশীরকে সে পরিয়ে নিল ছেলেদের পোশাক। মানদালী তাদের পালানোর খবর জানতে পেরে তাদেরকে পাকড়াও করতে পাঠালেন পাঁচ জন লোককে।

দুই দিন যাবার পর মন্ত্রীর লোকেরা তাদেরকে খুঁজে পেল। লোকগুলোকে দেখে পথ চলা থামিয়ে দিলো ইরবীদ। যেন তাদের অপেক্ষাই করছিল সে। সারশীরের কাছে মনে হলো যে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। সে চিৎকার করে বলল, 'তুমি থামলে কেন? আমরা কি নিজেদেরকে এভাবে সমর্পণ করে দেবো?'

সে উত্তর দিলো না। সৈন্যদল পৌঁছল। নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে। তারপর তাদেরকে ধরার জন্য কাছে আসল। সারশীর তার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। একটা বড় গাছের নিচে। গাছটাতে বসা ছিল কিছু চড়ুই পাখি। সারশীর গাছটাকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'আমরা এভাবেই হাল ছেড়ে দেবো? এতো নিজেকেই যবাই করার মতো হলো!'

কিন্তু এমন ঘটনা ঘটল যা সে ভাবতেও পারেনি। ইবরীদ ব্যগ্র সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদলের ওপর। একজনের তরবারি কেড়ে নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। তার বীরত্ব বিস্মিত করল সারশীরকে। এদিকে গাছের পাখিগুলোও উড়ে চলে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে ইরবীদ তিনজনকে শেষ করে দিলো। বাকি দুইজন ছুটে পালাল।

ইরবীদ দাঁড়িয়ে রইল। ওঠা-নামা করছে তার বুক। হাতের তরবারিতে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার মনে হলো হালকা হয়ে গেছে বুকের বিরাট বোঝা। কারণ সে নিজ মনিব হত্যার প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। সারশীর অবাক হয়ে বলল, 'তুমি তো বেশ সাহসী!'

ইরবীদ কোনো উত্তর দিলো না। সে দুইটা ঘোড়া নিল। একটাতে নিজে উঠল। আরেকটাতে উঠতে বলল সারশীরকে। এরপর দুইজনে পথচলা শুরু করল। তারা এসে পৌঁছল পারস্যে। সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করল। এ সুযোগে মেয়েটাও ফারসি ভাষা শিখে ফেলল। তারা ভারতবর্ষের সব খবরাখবর নেওয়া বন্ধ রাখল।

তবে ইবরীদের কাছে খবর আসল যে সুলতান মাহমূদ খিলজি সুলতান আবদুল হালীমের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। তিনিও তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর মন্ত্রী মানদালী সারশীর ও ইরবীদকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে। ভাবটা এমন যেন সে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বেই। সারশীর তাকে পরামর্শ দিলো বাগদাদে যাওয়ার। এই সফরে তাদের শেষ হয়ে গেল সব মাল-সামানা। অবশেষে তারা পৌঁছালো বাগদাদে। সারশীর ক্লান্ত গলায় বলল, 'ইরবীদ, আমাদের কী হবে? কিছু ভাবলে?'

সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি এক ব্যবসায়ীকে চিনি। আপনার বাবার বন্ধু ছিলেন। মিন্দাও গেলে আমাদের কাছে আসতেন।'

'কে সে? তার নাম কী?'

'ভুলে গেছি।'

মেয়েকে সাথে নিয়ে সে ব্যবসায়ীদের বাজারে লোকটার খোঁজ করতে লাগল। সেখানেই তাদের দুইজনকে হাকীম ইবনু মাহমূদ দেখল। সে বুঝতে পারল যে তারা দুইজন অপরিচিত মানুষ। তারা কোথাও আশ্রয় নিতে চাচ্ছে। হাকীম তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এই বাসায় নিয়ে আসল। তাদের জন্য হাজির হলো সব ধরনের আসবাবপত্র নিয়ে। মেয়েটা ইতোমধ্যে কুরআন শিক্ষা করার সময় আরবিও শিখে নিয়েছিল। কারণ আরবি ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষে উঁচু শ্রেণির মানুষের ভাষা। ভারতবর্ষে আরব দেশের ব্যবসায়ীদের আগমনের কারণে ইবরীদেরর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হতো। এ সূত্রে সেও আরবি ভাষা শিখেছিল।

সারশীর আর বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না। আবার অতীত থেকে ফিরে এল বাস্তবে। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারল না। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছ মুরীদ?'

তার দিকে না তাকিয়েই মুরীদ বলল, 'আমি বাগদাদ ত্যাগ করব।'

'আমাকে রেখে যাবে, মুরীদ!'

'হ্যাঁ।' শান্ত জবাব।

'কেন? কেন এমনটা করবে মুরীদ? আমি কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি?'

মুরীদের বুক তখনও ওঠা-নামা করছে। তার শরীরের গঠন ও রঙে সুন্দরই লাগছে। সে শান্ত স্বরে বলল, 'আমি আমার বিগত জীবন আপনার বন্দেগি করে

কাটিয়েছি। এবার বাকি জীবন আল্লাহর বন্দেগি করে কাটাতে চাই।'

তার হাত ধরে সারশীর বলল, 'এখানে কি কেউ তোমাকে নিষেধ করছে?'

হাতটা আলতোভাবে সরিয়ে মুরীদ জবাব দিলো, 'আমি এমন এক জায়গায় যেতে চাই যেখানে আমাকে কেউ চিনে না। আমি অতীতকে ভুলে যেতে চাই। দূর করে ফেলতে চাই অতীতের সকল দুঃখ-ব্যথা।'

'এই ধ্যান-ধারণা কবে থেকে তোমার মাথায় এসে জুটল?'

'যেদিন আমি দুনিয়াবিমুখ বান্দা ইয়াসারের সাথে সাক্ষাৎ করলাম সেদিন থেকেই।'

এবার ইয়াসারের দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা বলে যেতে লাগল—আপনি জানেন না তিনি কেমন লোক! আমি তাকে দূর থেকে দেখি, মনে হয় তিনি আখিরাতে চলে গেছেন। সেখানে সবকিছু দেখা শেষ করে আবার ফিরে এসেছেন দুনিয়ায়। তিনি সারাক্ষণই খারাপ কিছুকে ভয় করেন আর ভালোটা কামনা করেন। তার দু-চোখে ভেসে ওঠে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধদের ছবি। আবার ফুটে ওঠে জান্নাতের আনন্দে মাতোয়ারা ব্যক্তিদের দৃশ্যও। তিনি এমন একজন মানুষ যাকে অনেক মানুষই চেনে না।

মেয়েটা তার কথা শুনেই যাচ্ছিল। তার মনে চাচ্ছিল যদি সে আরও বর্ণনা দিয়ে যায়। কারণ সে তো জানে ইয়াসার কী রকম লোক। হাকীমের বাড়িতে প্রথম নজর দেখার সাথে সাথেই সে বুঝে গেছে—এ এক ভিন্ন মানুষ! এ কারণেই নিজের ব্যাপারে তাকে ভয় করেছে আর তার ব্যাপারেও নিজেকে ভয় করেছে।

মুরীদ বলেই চলল, 'আমি তার সাথে প্রথম যে-বার সাক্ষাৎ করি তখনকার কথা আমার এখনও মনে পড়ে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি হচ্ছ মুরীদ। মুরীদ মানে যার ইচ্ছা শক্তি প্রবল। তুমি আল্লাহকে ভয় করে পাপাচার থেকে বেঁচে থাকো। আমি নিজের ব্যাপারে ভাবলাম। ভাবলাম আপনার ব্যাপারে। ইয়াসারের ব্যাপারেও ভাবলাম। এই যুবকটার সম্পদ, শক্তি ও সৌন্দর্য—সবই আছে। কোন মেয়ে তাকে চায় না? কিন্তু তিনি যে পবিত্র যুবক। তার সফেদ অন্তরে সামান্যও মলিন হতে দেন না। বিস্মিত হবেন না তার সামান্য অবতরণে। কারণ তিনি নিচে নামেন ওপরে ওঠার জন্যেই। কাছে আসেন আরও দূরে সরে যাওয়ার জন্য। তিনি আরোহণ করেন উড়ে যাওয়ার জন্যই। তিনি প্রতিটা কাজের জন্য নিজের হিসাব নেন। এভাবে অন্তরকে সোজা পথে পরিচালিত করেই তবে ক্ষান্ত হন।'

মুরীদ থামল। তবে তার বুকটা ওঠা-নামা করছে। মনে হলো যেন তার বুকে

দাউদাউ করে জ্বলছে আগ্নেয়াগিরির আগুন। আর সে আগ্নেয়াগিরি অগ্ন্যুৎপাত করতে যাচ্ছে।

সারশীর বলল, 'কিন্তু ইরবীদ...'

মুরীদ তাকে থামিয়ে বলল, 'ইয়াসার আমার নাম দিয়েছেন মুরীদ। আমি এর পরিবর্তে আবার পুরাতন নাম চাই না। অন্য নামও চাই না। আপনিও এ নাম মেনে নিয়েছেন।'

মেয়ে বলল, 'কিন্তু মুরীদ...'

মুরীদ বলল, 'আমি চাই আপনি প্রথমে আমার কথা শুনেন। এই হাকীমের কথা শুনে আপনার কী উপকার হচ্ছে? তার এই সব ছলনা আপনার জন্য নিয়ে আসবে কঠিন বিপদ।'

তাকে চলে যেতে দেখে মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মুরীদ, আমার কথা শুনো।'

মুরীদ বলল, 'লাভ নাই। আমি ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। আগামীকালই চলে যাব।'

এবার বেশ রেগে মেয়ে চিৎকার করে বলল, 'মুরীদ, আমার কথা শুনো।'

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে শান্ত হলো। তারপর গলাকে অনেক নরম করার চেষ্টা করে বলল, 'তুমি কি কয়েকদিন অপেক্ষা করতে পারবে। আমিও তোমার সাথে যেতে পারি।'

মুরীদ অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, 'না, কক্ষনো না। আমাদের সম্পর্ক ভেঙে গেছে। আমি আপনার জন্য উপযুক্ত নই। আমাকে বাদ দিয়ে আরেকজন খুঁজে দেখেন। আমি চলতে চাই ইয়াসারের পথে। আমি তাওবা করেছি। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? আমি তাওবা করেছি। তাওবার মানে জানেন আপনি?'

সে ফিসফিস করে বলল, 'আমিও তাওবা করব। কসম কাটছি।'

মুরীদ বোঝা বহন করে বলল, 'না, এই আমাদের শেষ দেখা। বিদায়!'

মুরীদ চলে যাওয়ার আগে মেয়ে চিৎকার করে বলল, 'অপেক্ষা করো।'

মেয়ে এবার ভেতরে গিয়ে আবার ফিরে এল। তাকে বলল, 'এই নাও। এটা দিয়ে প্রয়োজন পূর্ণ করো।'

মুরীদ তার দিকে নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মেয়ে তাকে এক থলে অর্থ দিতে চাচ্ছে। সে ভাবছে এই বিশ্বস্ত দাসকে দেওয়া এটাই শ্রেষ্ঠ উপহার হতে পারে। কিন্তু

মুরীদ বলল, 'না, মালকিন। আমি হারাম সম্পদ দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছতে চাই না। হারাম সম্পদ আল্লাহর কাছে পৌঁছতে দেয় না। আমি নিজ হাতের শ্রম দিয়ে কিছু কামাই করেছি। অনেক রাত আমি ঘুমাইনি। আমি একবার আমার রবের সামনে দাঁড়াতে চাই পরিষ্কার কাপড়, পবিত্র দেহ ও পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে। পাপের কলুষতা যেন আমাকে কলুষিত না করে। বুঝেছেন মালকিন? আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি।'

মুরীদ তার কাঁধে একটা ব্যাগে করে আসবাবপত্র নিয়ে রওনা হলো। এদিকে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো সারশীর। তারপর তার দৃষ্টি মেলে তাকে বিদায় জানাল। দেখতে দেখতে রাতকে ঢেকে ফেলা অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল যে তার দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

মুরীদ চলে গেছে।

ইয়াসার যখন তাকে বলেছিল—'আল্লাহর যমীন প্রশস্ত।' তখন যে ইশারা দিয়েছিল তা সে জীবনমনে ধারণ করেছে।

সারশীর মনে হলো তার খুব প্রিয় একটা জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে লোকটার সাথে সে সব আনন্দ-বেদনার বিষয়গুলো ভাগাভাগি করে নিত, যার সাথে সুখ-দুঃখের কথাগুলো বলা যেত, সে-ই আজ তাকে এই অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ছেড়ে চলে গেল।

সে তাওবা করেছে।

তার দীর্ঘ গমনপথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সারশীর। দেখতে পেল একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে চলেছে। গান গাচ্ছে একটা শিশু। তার গান গাওয়ার শব্দ বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

ভেতরে ঢুকে নিজের পরিণতি ভাবতে লাগল।

ইয়াসার...।

না, তাকে বিয়ে করা যাবে না। মুরীদ যেমনটা বলেছে—তার ভালোবাসার আলো নিভে গেছে। সে নিজের অন্তরকে সোজা পথে পরিচালনা করে তবেই ছাড়বে।

ইয়াসার তার জন্য না।

সে ইয়াসারের জন্য না।

ইয়াসার তার জগতের কেউ না।

সারশীর তো ইয়াসারের জগতে উত্থিত হতে পারবে না। তবে কি ইয়াসারকে নিজের জগতে নামিয়ে আনা যাবে?!

তার মনে হলো হাবীব তাকে ফিসফিস করে বলছে—'আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, তুমি এমনটা কোরো না।'

হাবীব বলেই চলেছে, 'ইয়াসারের কাছে পৌঁছতে সাতটা দরজা অতিক্রম করতে হয়। এ সাতটা দরজায় সাতটা লোহার তালা আছে। তুমি কেন মরীচিকার পিছনে ছুটছ?'

না! ভালোয় ভালোয় সরে পড়াই ভালো হবে। না জানি পরে কোন বাজে অবস্থায় পড়তে হয়।

হ্যাঁ, সারশীর তার পথ থেকে সরে যাবে। তার থেকে পালিয়ে যাবে।

ইয়াসার আসলেও তার জন্য দরজা খুলে দিবে না। কিছুতেই না।

কিন্তু সে কি তা করতে পারবে?

পরাজিত হৃদয়

ইয়াসার জানে না সে কীভাবে মাগরীব ও এশার সালাত আদায় করেছে।

সে জানে না তার দু-পা কীভাবে তাকে ওই মেয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারছে না কীভাবে নিজেকে সুযোগ দিয়েছিল এ কথাগুলো বলার।

সে এশার সালাতের পর বাড়ির পথে যাচ্ছিল। সামান্য আলো দিচ্ছে বিষণ্ণ চাঁদটা। ঠান্ডা বাতাস বইছে। আকাশে ছড়িয়ে আছে মেঘমালা।

কীভাবে ওই মেয়ের ঘরে সে গেল?

সে তো যেতে চেয়েছিল কবরস্থানে। সেখানে যা-কিছু লেখা আছে সেগুলো পড়ে দ্বীনের ওপর নিজের দৃঢ়তা ও ধৈর্য ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। কারণ কবরস্থানের উপদেশ হৃদয়কে নাড়া দেয়।

কিন্তু নিজেকে সে কোথায় পেল?

তার সামনে যেন ওই মেয়ে। তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। তার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। দু-চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে অন্তর থেকে কথা বলছে।

তার দিকে যেন শরবতের গ্লাসটা এগিয়ে দিচ্ছে।

নিজ হাতে। নিজেই দিচ্ছে।

সহসা সচকিত হল ইয়াসার। নিজেকে সারশীর বাড়ির সামনে আবিষ্কার করল। মানে কী? তবে কি মজনুর ব্যাপারে যা বলা হয় তা সত্যিই! ইয়াসার দরজার ওপর

হাত রাখল। এখানে নিশ্চয় সারশীরও হাত রাখে।

চারদিকে তাকাল।

এই সুউচ্চ খেজুর গাছটা সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত। তার দিকে যেন চেয়ে আছে নীরব-নিশ্চুপ হয়ে। হালকা বাতাসে গাছের পাতা আন্দোলিত হয়ে সামান্য আওয়াজ করে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

ঘরের দরজায় কাঁধ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়াসার।

বাতাস আরও জোরে বইতে লাগল। ফানুসগুলোও নিভে গেল। চাঁদটা বেশ ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে। সৌন্দর্যের কোনো ছোঁয়া এর মাঝে নেই। নীরব, নিস্তব্ধ একটা রাত।

ইয়াসার পিছু হটতে লাগল। তার অন্তর মেয়ের ঘরের দিকে ঝুঁকছে শুধু।

ঘরে ফিরে যখন নিজের রুমে প্রবেশ করল তখন প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট অনুভব করল ইয়াসার। তার মনে হলো যেন ঘরের দেয়ালটা তার পরাজিত হৃদয়টাতে আরও প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলছে। দ্রুত জানালা খুলল সে। বাইরের বাতাস আক্রমণ করল তাকে। ইয়াসার বুক ভরে শ্বাস নিতে চাইল। শাইখ একদিন তাকে যে কথা লিখে দিয়েছিলেন এবং বারবার পড়তে বলেছিলেন তা মনের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—

رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

"হে আমার রব! আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আর আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে দয়াময়।" (সূরা আম্বিয়া : ৮৩)

নদীর পানি মিশ্রিত বাতাস ইয়াসারের অন্তরকে ভিজিয়ে দিলো। সে প্রশান্তি অনুভব করল। তারপর মেয়ের ঘরে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল। এই ঘটনা হতে দেওয়া যাবে না বারবার। আর ফিরে না যাওয়াই ভালো হবে। তাকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে অন্তর থেকে। মনের চাদরে তার কোনো আলামত থাকতে দেওয়া যাবে না। তা না হলে...

তার মা তার দিকে বারবার তাকিয়ে ব্যথিত হন। নিশ্চয় তার ছেলে ভীষণ সমস্যায় পড়েছে; যে সমস্যা থেকে উত্তরণের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তিনি তার আদরের ছেলেকে সাহায্য করতে চান।

কিন্তু কী সেই সমস্যা?

তার মা সব ধরনের সমস্যার কথাই ভাবলেন; কিন্তু এই সমস্যার কথা তার মাথায়ই আসল না! একটি ঝড় এসে তার অন্তরে তুলে দিয়েছে দুঃখ-দুশ্চিন্তার জোয়ার। কিন্তু সে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এক চাদর দিয়ে তা মানুষের চোখে প্রকাশিত হতে দিচ্ছে না। তারপরও তা প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে—সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও।

তার বাবা তার দিকে ফিরেও তাকান না। তিনি সারাদিন বাজার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বাড়িতে শক্তিহীন অবস্থায় ফিরে আসেন এক রাশ ক্লান্তি নিয়ে। তার প্রশান্তিকে নষ্ট করে এমন কিছু তিনি কানেই নেন না।

কিন্তু ভাইয়ের অবস্থা মমতাময়ী ছোটো বোন সানার চোখ এড়ায় না। সে বারবার তার দিকে তাকিয়ে ব্যথিত হয়। তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে, আপনার কী হয়েছে? ইয়াসার শুধুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতুবা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ছোটোবোন আবার নিজের বিড়ালের পিছনে ছুটতে ছুটতে চলে যায়।

ইয়াসারের সব শক্তি ফুরিয়ে গেল। তার মনে হলো সে পৌঁছে গেছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। নফসের সাথে আর যুদ্ধ করা সম্ভব না। মেয়ে তার অন্তরের ভেতরটায় এমনভাবে পৌঁছে গেছে, যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণ তাকে টেনে ধরে রাখছে। অন্তরের ভেতরে থেকেও মেয়েটাও কীভাবে যেন তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

ইয়াসারের ভেতরে অশান্তি আর কষ্টের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল। তার মধ্যে দেখা দিলো বিরাট পরিবর্তন। চলে গেল স্থিরতা। এক অদ্ভুত একাকিত্ব অনুভব করতে লাগলেন সারাটাক্ষণ। প্রবল নিরাশা তাকে ঘিরে ফেলল চারিপাশ থেকে। কী দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করবে তা সে ভেবে পেল না।

আগের সেই প্রশান্ত ইয়াসার এখন আর নেই। শাইখের পাশে বসে আলোচনা শোনার সময় অন্তরটা যেমন আলো ও আনন্দে ভরে উঠত, ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হতো, তেমনটা তার আর হয় না। কোথায় যেন সেই আনন্দ হারিয়ে গেছে। রুটির দোকানের পাশের বাড়িটায় হারিয়ে গেছে ইয়াসারের জীবনের সব সুখ। হৃদয়ের মাঝে পড়ে গেছে এক কালো-ছাপ।

অসুস্থ ব্যক্তির মতো সে সারাক্ষণ ছটফট করতে থাকে।

আবূ মাহমূদ তার এই অবস্থা দেখে একটুও দয়া করেনি। উল্টো সে তাকে মদ পান করার মাধ্যমে চিকিৎসার পরামর্শ দিতে থাকে।

তবে ইয়াসার দৃঢ়তার সাথে জবাব দেয়, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। সেদিন যেন না আসে যেদিন এ অপকর্ম আমার করা লাগে।

তার সালাত এখন মৃত প্রাণহীন হয়ে গেছে। অন্তরে এর কোনো স্থান নেই। তাকে দেখে একটি মৃতপ্রায় গাছের শুষ্ক কিছু পাতার কথা মনে হয়। যেন যে-কোনো সময় পাতাগুলো শিগ্‌গিরই ঝরে পড়বে!

ইয়াসারের অন্তরের গহীন ভেতরে আগুন যেন দাউদাউ করে জ্বলছে। অস্বস্তি ও বিরক্তিতে জ্বলে যাচ্ছে তার ভেতরটা। সে বুঝতে পারছে কেন মানুষ লোভনীয় কাজের দিকে ছুটে যায়। কেন তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়।

তার কাছে গোপনীয় বিষয়গুলো ধরা দিতে লাগল সুস্পষ্ট হয়ে।

তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবনযাপন করত। তাদের এ জীবনে কোনো স্বাদ নেই। তারা চলে এক কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে। সেখান থেকে পালিয়ে তারা আরও জটিল ও বিদঘুটে রাস্তায় যায়। এভাবে তারা আগুন ও উত্তপ্ত বালুর মাঝে স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তারা প্রশান্তি বা বিশ্রাম পায় না। তাদের মনে সুখপাখি বাসা বাঁধতে পারে না।

সবকিছু তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু ইয়াসারও যে তাদের পথেই চলেছে। খুব ভালো করেই সে জানে এর পরিণতি। কিন্তু কেন তাদেরকে ছাড়তে পারছে না?

কোথায় যাচ্ছে সে?

নিজ সাথিদের কাছে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত সে আর নেই। পবিত্র ভাইদের কাছে চলে যাওয়ার সুযোগ নেই—যে ভাইয়েরা একটা কথা বলার আগে বারবার তা উল্টেপাল্টে দেখে নেয়। তারা ভেবে দেখে এ কথার ভেতরে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, এমন কিছু আছে কি না।

আমরা যেভাবে খেজুর খাওয়ার আগে পর্যবেক্ষণ করে সবচেয়ে নিখুঁতটা বেছে নিই তেমনিভাবে তারা কথাকে বিশুদ্ধ করে তারপর বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এমনভাবে চলে যেন জাহান্নাম তাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

অথচ এরা...?

এরা খেল-তামাশায় লিপ্ত। মনে হয় যেন জান্নাতটা তাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা দুনিয়াবী জাহান্নামের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, তবু জীবনের স্বাদ খুঁজে

পাচ্ছে না। এমনকি কেউ কেউ এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসেবে নিজেকে হত্যা করাকে বেছে নিচ্ছে!!

আর মেয়েটা...!

ইয়াসার তো তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আর দুআ করে না আল্লাহর কাছে। বরং তাকে দেখার জন্য মনটা আকুল হয়ে ওঠে। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ভাবে তাকে দেখার কথা। তার হাসি, বিষণ্ণতায় ভরা দুইটি চোখ আর অন্তরে শিহরন তোলা কণ্ঠস্বর—সবকিছু যেন সে অনুভব করতে পারে অনেক দূরে থেকেও।

তার প্রতিটি বিষয় যেন চোখের সামনে দেখতে পায় ইয়াসার। প্রতি মুহূর্তেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মেয়েটার চেহারা।

কী অপূর্ব সেই মুখটা!
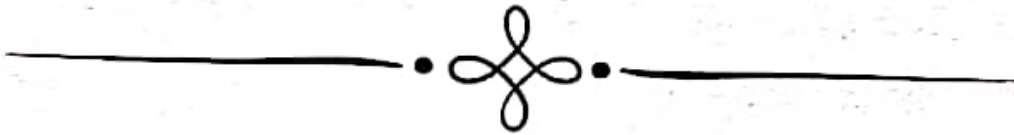
যুহদ ও হাস্‌সান

ইয়াসারের পরিবর্তন দেখে আবূ মাহমূদ যারপরনাই খুশি হলো। সে হাততালি দিয়ে বলল, তোমাদেরকে বলেছি না, আমি নিজ হাতে তাকে মদপান করাব।

আবূ মাহমূদ মনে করত সে বশ করতে পারবে যে-কোনো মানুষকেই। সে যত বড় মানুষ হোক আর যত বড় বুযুর্গই হোক না কেন। ওই লোক যদি নিজেকে মানুষ ও জিন শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরেও ফেলে তবুও বাঁচতে পারবে না। শয়তান যদি কাউকে বশ করতে না পারে তবুও সে আবূ মাহমূদ তাকে বশ করেই ফেলবে।

হাস্‌সান তাদেরই একজন, যে হাকীমের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিল। তার ছিল এক ফুফাতো বোন। একজন পুরুষ যেমন একজন নারীকে ভালোবাসে তেমনিভাবে সেও ভালোবেসেছিল তার ফুফাতো বোনকে। মেয়েটা ছিল সুন্দরী, দ্বীনদার ও ভদ্র।

তারা একই বাড়িতে বাস করত। একই সাথে বেড়ে ওঠে। তারা একসাথে খেলত। কুরআন কারীমের ছোট্ট সূরাগুলো পরস্পর পাঠ করত। ফুফাতো বোন যুহদ সব সময় তাকে ছাড়িয়ে ফেলত। তাকে পিছিয়ে পড়তে দেখে যুহদ হাসাহাসি করত তাকে নিয়ে।

তার হাসিও হাস্‌সানের কাছে ভালো লাগত। বিশেষ করে যখন মুখের ভেতরে থাকত রুটির টুকরো। কিন্তু সে বেশি হাসলে আর সীমা অতিক্রম করে ফেললে হাস্‌সানের বেজায় রাগ হত। কখনও তাকে মারত। যুহদ তখন কাঁদতে কাঁদতে চলে যেত তার মায়ের কাছে। তার মা রেগে তার ওপরই রাগ ঝাড়ত।

কখনও দুইজনের মাঝে খেলা বন্ধ করে দিত। এটাই ছিল তার জন্য সবচেয়ে কষ্টদায়ক শাস্তি। কারণ হাস্‌সান যুহদকে ছাড়া থাকতে পারত না। অন্য কারও সাথে খেলে তেমন মজাও পেত না। মহল্লার অন্যান্য কোনো ছেলে-মেয়েকেই তার কাছে যুহদের সমান মনে হত না।

তার মনে পড়ে কীভাবে তারা দুইজন খেলা করত। সে ঘরের এক কোণে দাঁড়াত আর যুহদ দাঁড়াত আরেক কোণে। দুইজন ছোটো বল ছোড়াছুড়ি করত অথবা ইশারাইঙ্গিতে কথা বলত।

দুইজন অনেক বেশি হাসত।

তার হাসি কখনও হাস্‌সান ভুলতে পারে না। সে যখন ছোটো হাত তুলে দেয়ালে লিখত—'আম্মা', তখন হাস্‌সান দৌড়ে পালাত।

যুহদ হাস্‌সানের টুপি নিয়ে মহল্লার গলিতে পালিয়ে বেড়াত। ছুটে গিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করত হাস্‌সান। তার চুলের ঝুঁটি ধরে ফেলার প্রচেষ্টা চালাত। কিন্তু সে তার দুই হাতের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেত। যুহদ ক্লান্ত হয়ে পড়লে বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিত মায়ের কোলে। আর হাস্‌সান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকত। মনে মনে ভাবত, যদি তাকে একবার ধরতে পারতাম। কিন্তু তার মা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আর টুপিটা যুহদেরই মাথায়। সে জিহ্বা বের করে ভেংচি কাটছে।

যুহদের মা ছিলেন খুবই কড়া মেজাজের। সারাক্ষণ মুখটা ভার করে রাখতেন। যুহদের জামাকাপড়ে ময়লা দাগ দেখলেই বকাঝকা করে সব দোষ ফেলতেন হাস্‌সানের ঘাড়ে।

হাস্‌সান জানত না কেন যুহদের মা তাকে এত ঘৃণা করে। কেন বাবার সামনে সব সময় তাকে অপদস্থ করে।

যুহদের মায়ের এই রূঢ় আচরণ সত্ত্বেও সেদিনগুলো ছিল তার শৈশবের সোনালি দিন।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করে হাস্‌সান আবিষ্কার করল, যুহদ নেই...। তার চুল স্পর্শ করছে না হাস্‌সানের মুখ। শোনা যাচ্ছে না তার আওয়াজ। হাস্‌সানকে বলা হলো, সে তার মায়ের সাথে চলে গেছে। কেউ কেউ বলল, তার মা বিয়ে করে নতুন স্বামীর ঘরে উঠেছেন।

হাসসানের মা তার দু-চোখের পানি মুছে বলল, 'বাবা, কেঁদো না। সে আবার

আসবে। তার মায়ের সাথে আমাদেরকে দেখতে আসবে।'

সে অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগল। দিনের-পর-দিন কেটে গেল। তার অনুপস্থিতির কাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। একাকী হলেই হাস্‌সান কাঁদত। যুহদ তার কিছু খেলনা রেখে গিয়েছিল। সেগুলো সে দেখত। হাস্‌সান কক্ষনো এগুলো ভুলবে না। হাস্‌সান কক্ষনো ভুলবে না যুহদকে।

পরে জানতে পারল যুহদ নাকি দুইবার দুপুরবেলায় এসেছিল। কিন্তু এ সময় সে ঘুমিয়ে ছিল! এরপর থেকে সে প্রতিজ্ঞা করল, জীবনেও আর দুপুরে ঘুমাবে না। কিন্তু আর পাওয়া হলো না তার দেখা।

বছরের পর বছর কেটে গেল। যৌবনে পদার্পণ করল হাস্‌সান। হাস্‌সান এখন আল্লাহভীরু ও দ্বীনদার যুবক। আলেমদের মজলিসে নিয়মিত তার যাতায়াত। তার মানসপটে যুহদের ছবি তবুও অঙ্কিত রয়ে গেল।

একদিন জুমআর সালাত আদায় করে সে মাসজিদ থেকে ফিরে এল। ঘরে প্রবেশ করে শুনতে পেল, এই তো সে ফিরে এসেছে। স্তম্ভিত হয়ে গেল হাস্‌সান। তার কয়েক পা সামনে দাঁড়ানো এক মেয়ে। লম্বা ও ছিপছিপে গড়নের এক চমৎকার যুবতী। তার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। হাস্‌সানও তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিশ্বাসও করতে পারছিল না। ঢিপঢিপ করতে লাগল তার বুকের ভেতরটা। সে কথা বলতে চাইল। কিন্তু মুখে কথা আটকে গেল। তাকিয়ে দেখল, যুহদের দু-চোখ থেকে অনবরত গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

হাস্‌সান অন্তরের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'যুহদ!'

এক পা এগিয়ে যুহদও হাত বাড়িয়ে বলল, 'হাস্‌সান!'

তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না।

তীব্র আগ্রহে মিলিত হলো দুই হাত।

দু-চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল।

হাস্‌সান চারিদিকের সবকিছু ভুলে গেল। ভুলে গেল তার মা, বোন ও বাবার উপস্থিতি। ভুলে গেল যুহদের মায়ের উপস্থিতি। তার টানা দুই চোখের দিকে তাকিয়ে হাসসান বলল, 'যুহদ!'

সেও জবাব দিলো, 'হাস্‌সান!'

হাস্‌সান নিজের দুইচোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে আবার বলল, ‘যুহদ, তুমি বড় হয়ে গেছ।’

যুহদ বলল, ‘তুমিও হাস্‌সান।’

‘তুমি চলে যাওয়ায় আমি অনেক কেঁদেছিলাম।’

‘আমিও তাই করেছি হাস্‌সান।’

‘আমি মারাই যাচ্ছিলাম।’

‘আমিও হাস্‌সান।’

‘কেন এত দিন আসোনি?’

‘পারিনি যে!’

‘আমি আল্লাহর কাছে চাইতাম যেন তিনি আবার আমাদের দেখা করিয়ে দেন।’

‘আমিও হাস্‌সান।’

‘যুহদ, তোমাকে চমৎকার লাগছে’—চুলের গোছার দিকে তাকিয়ে বলল হাস্‌সান।

‘আমি এমনই’—যুহদের দুই গাল গোলাপি রঙ ধারণ করল।

তাদের আত্মা আরও কথা বলত। চোখ দুটো অন্তরের মাঝে যোগাযোগ স্থাপন করে। বিগত বছরের ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে থাকে। যেটা জিহ্বা দ্বারা খুব কমই প্রকাশ করা যায়।

একে অপরের হাত ধরেই রইল।

হাস্‌সান সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি এখানে থাকবে যুহদ।’

ইতিবাচক সাড়া দিয়ে সে বলল, ‘হ্যাঁ, হাসসান।’

যুহদের মা-ও বলল, ‘হ্যাঁ, হাস্‌সান। তুমি যেমনটা চাও, সে এখানে ঠিক সেভাবেই থাকবে।’

এবার যুহদ সরিয়ে নিল তার হাতটা। হাস্‌সানও ছেড়ে দিলো তাকে। হাস্‌সানের ফুপির কণ্ঠে পাওয়া গেল তীব্র নিরাশার ও দুশ্চিন্তার ছাপ। তার দিকে তাকিয়ে হাস্‌সান সালাম দিলো।

তবে ছোটোবেলায় যেমনটা মনে করেছিল তিনি তেমনটা নেই। এবার তাকে জড়িয়ে ধরে তার দিকে তিনি চেয়ে রইলেন। ফুপি এখন আর সেই লম্বা কঠোর মনের

নারী না। তিনি অন্যান্য নারীদের মতোই সাধারণ। তার ভেতর জায়গা করে নিয়েছে একটা পবিত্র আত্মা। তিনি এখন হাসেন। কাঁদেন।

তার দ্বিতীয় স্বামীও মারা গেছে। তাই তো আবার ফিরে আসতে হলো ভাইয়ের ঘরে। এখানেই তিনি থাকবেন। যুহদও থাকবে তার পাশে।

রাতের বেলা এশার সালাত আদায় করেই ঘরে ফিরে এল হাস্‌সান। প্রতি রাতে যেরকম দেরি করে আজ ততটা করেনি। শাইখ আবুল ওয়াফার মজলিসে আজ আর বসা হয়নি। বাড়িতে ছুটে চলল সে, যুহদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। সে তীব্র আনন্দে উদ্বেল হয়ে গিয়েছে। তার আনন্দ এখানেই শেষ হয়নি। শুনতে পেল বাবা তার ফুপির সাথে যুহদ আর তার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলছেন।

তার বুকটা টিপটিপ করতে শুরু করল। জবাব শোনার জন্য সে আগ্রহী হয়ে রইল। কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। ওই রাতে সে সাজদায় পড়ে মহান ও দয়ালু আল্লাহর কাছে হাত তুলে সে যুহদকে চাইল। ফাজরের আযান দেওয়ার পর মসজিদে গেল বাবার সাথে।

মন বলছিল, বাবা কেন বলছেন না? ফুপির সাথে কী কথা হলো।

কিন্তু বাবা ভোরের দুআ ও মাসজিদে যাওয়ার দুআ পড়তে পড়তে অগ্রসর হলেন।

সে জিজ্ঞাসা করতে উদ্যত হলো।

এ সময় তার বাবা হঠাৎ থেমে বললেন, অনেক পীড়াপীড়ির পর রাজি হলাম।

হাস্‌সান তার দুই কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। মনে হলো, বাবা কথাটা যদি আরেকবার বলতেন। সে চিৎকার করতে বলতে চাইল, 'কী বাবা?'

তার বাবাও তাকে সুযোগ দিলেন। গলির অন্ধকার পাশে গিয়ে সেখানে নিজ পুত্রের মুখভঙ্গি নিজের থেকে লুকিয়ে নিলেন। তারপর বলল, 'আমি রাজি হয়েই গেলাম।'

তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'তুমি ফুপাতো বোনকে বিয়ে করবে।'

হাস্‌সান খুশিতে উপচে পড়ল। সে বাবাকে মুখে ও হাতে চুম্বন করল। তারপর সাজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া করল।

তাকে বিয়ে করল।

নয়-মাসের সংসার কেটে গেল।

নয়-মাস যেন স্বপ্নের মতো ছিল দিনগুলো।

যুহদ অনেক স্বপ্ন দেখত। সেই স্বপ্নগুলো হাস্সানকে বলত। স্বপ্নগুলো আবার বাস্তবেও পরিণত হতো।

মধ্যরাতে হঠাৎ জেগে উঠে সে দেখত যুহদ রুমের এক পাশে সালাত আদায় করছে। সে যেন রাবেয়া বসরি। সে যেন এক আল্লাহর প্রিয় বান্দি। সে বাস করত ফেরেশতাদের জগতে। তাকে দেখে মনে হতো, জান্নাতের কোনো হূর যেন দুনিয়ায় সামান্য কয়েকদিন ভ্রমণের জন্য এসে দ্রুত আবার ফিরে গেছে নিজ গন্তব্যে।

নয় মাস।

মাত্র নয়টা মাস...। যেন দেখতে দেখতেই কেটে গেল।

তারপর হঠাৎ একদিন তার যুহদ মারা গেল।

হাস্সানের সামনে তার সমস্ত দুনিয়াটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার কাছে সূর্যের মতো ছিল যুহদ। তার উপস্থিতি তাকে আলো দিত। তাকে আনন্দ দিত তার মুচকি হাসি। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে কী মধুর অনুভূতি ছিল!

হাস্সান পাগল হওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু সে স্বপ্নে দেখল যুহদ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তাকে ধৈর্যধারণ করতে বলছে। তাকে বলছে, হাস্সান, নিরাশ হয়ো না। আমি অপেক্ষা করছি। একবার বলল, 'হাস্সান, নিজের প্রতি রহম করো।'

তার বাবা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষা খুঁজে পেল না। কোনো উপায় দেখতে পেল না।

এই দিনগুলোতেই তার সাথে হাকীমের দেখা। সে তাকে মদপানের মাধ্যমে চিকিৎসার পরামর্শ দিলো। প্রথমে কথাটা শোনার সাথে সাথে তার বেজায় রাগ হলো। সে হাকীমের দিকে রেগেমেগে তাকাল। কিন্তু পরে তার কথাই মেনে নিল। তার সাথে গেল বিভিন্ন গোপন আস্তানায়।

যে রাতে সে মদ পান করল, সে রাতে স্বপ্নে দেখল—তার স্ত্রী তাকে রেখে দূরের সবুজ মাঠে পালিয়ে যাচ্ছে। আর নিজেকে সে আবিষ্কার করল কালো ধ্বংসাবশেষের মাঝে। তারপর থেকে আর তাকে দেখতে পেল না।

এখন আর সে তাকে সান্ত্বনা দেয় না। তাকে ধৈর্যধারণ করতে বলে না। সে আর ফিরে আসে না স্বপ্নে। আর এদিকে হাস্সানও পুরোপুরি মজে গেল খেল-তামাশায়।

নব আগন্তুক

যে ব্যক্তি মানুষকে উত্তম জিনিস শিখায় আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকে, ভ্রান্তির দিকে নিয়ে চলে আর অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে চলতে সহায়তা করে তাদের মাঝে কত বিশাল পার্থক্য, কী বিস্তর ফারাক তা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট! তাদের নিন্দা আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কিতাবে করেছেন।

হাকীম ইবনু মাহমুদের মাঝে শেষোক্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সে হয়তো শৈশবে এমন কিছুই শিখেনি যা তাকে বড় হলে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে মৃত্যুর পরে যা হবে তার জন্য কাজ করে। আর যে নিজের আত্মাকে প্রবৃত্তি অনুসরণ করতে দেয়, আল্লাহর কাছে অলীক কল্পনার মতো আশা করে সে তো বিভ্রান্ত। হাদীসে এমনটাই এসেছে।

তারা সবাই একত্র হলো সারশীর ঘরে। মজলিসে সবাই সমবেত হলে আবূ মাহমূদ জিজ্ঞাসা করল, 'আরে, চাকরটা গেল কই?'

সাঈদ বলল, 'সে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে।'

হাবীব তাকে শেষ করতে দিলো না, 'সে তাওবা করেছে। এই নিকৃষ্ট কাজ করতে তার মন সায় দেয়নি।'

হাকীম রেগে-মেগে চিৎকার করে বলল, 'হাবীব! তুমি আজ রাতে আমাদের আনন্দ মিটাতে চাচ্ছ?'

হাবীব মাথা ঝাঁকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'না, আমি জেনেশুনেই বললাম। তোমার

সামনেই তো সারশীর আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেই পারো।'

'তাকে আবার চাকরিতে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে বশ করব।'

'তাকে তুমি খুঁজেই পাবে না। সে আর আসবে না।'—হেসে হেসে বলল হাবীব।

কেউ কিছু বলার আগেই হাবীব বলে চলল, 'সে বাগদাদ ছেড়ে চলে গেছে। সে যে কোথায় গেছে কেউ জানে না। সে এমন এক জায়গায় যেতে চেয়েছে যেখানে কেউ তাকে চিনে না। নতুন করে সুন্দর পবিত্র জীবন শুরু করবে সে।'

সাঈদ তার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

আবূ মাহমূদ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কীভাবে জানলে যে সে অজানা এক জায়গায় গেছে?'

হাবীব জোর দিয়ে বলল, 'যেদিন সে বাড়ি ছাড়ল সেদিন সন্ধ্যায় দেখেছিলাম তাকে। তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে কোথায় যাচ্ছে। উত্তরে বলল, সে ইবাদাতের জন্য পূর্ণ সময় দিবে। পাপের গ্লানি থেকে মুক্ত শুরু করবে এক নতুন জীবন।'

আবূ মাহমূদ তার কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সে আমাদের কাছেই ফিরে আসবে। প্রবল অনুশোচনায় ভুগবে সে।'

সাঈদের জবাব, 'না, আবূ মাহমূদ। তুমি দেখো, সে আর ফিরবে না। আমি নিশ্চিত।'

আবূ মাহমূদ সজোরে দস্তরখানায় আঘাত করে বেশ জোর দিয়ে বলল, 'সে ফিরবেই। তারপর মাথা নুয়ে আমাদের হাতে চুম্বন করে ক্ষমা চাইবে।'

হাস্‌সান মাথা তুলল। এতক্ষণ সে চুপ ছিল। সে হাকীমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় না।'

আবূ মাহমূদ এবার হেসে কথা ঘুরানোর উদ্দেশ্যে বলল, 'আচ্ছা, সে যাক গে। ওকে দরকার নেই আমাদের।'

এরপর হাবীবের দিকে তাকিয়ে আবূ মাহমূদ বলল, 'তার থেকেও ভালো লোক আমাদের কাছে আসবে।'

সাঈদ বলল, 'কে সে?'

হাবীব কথা বলারই সাহস পেল না। এই ভয়ে, যদি ব্যক্তিটা ইয়াসার হয়!

আবূ মাহমূদ হাবীবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলো তো হাবীব, কে হতে পারে?'

হাকীমের কথার ভঙ্গি হাবীবের মনে জাগিয়ে তুলল ভয়। সে চুপ করে তাকিয়ে রইল। হয়তো শয়তান তার কাজে সফল হয়েছে। আবূ মাহমূদ আবার তার আঙুল দিয়ে দস্তরখানায় ঠোকর দিয়ে বলল, 'হাবীব! তোমার বন্ধু তো ফাঁদে পা দিয়েছে।'

হাবীব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সম্পর্কে কিছুই জানত না। তাই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জবাব দিলো, 'কক্ষনো না।'

আবূ মাহমূদ বারবার দস্তরখানে আঘাত করতে করতে বলল, 'সে আসবেই।'

হাবীব ডান হাত তুলে হাকীমের মুখের সামনে আঙুলটা নাড়িয়ে বলল, 'অসম্ভব। ইয়াসার কখনও এই ফাঁদে পা দিবে না। সে বাজ পাখির মতো শুধু ঊর্ধ্বাকাশেই উড়ে বেড়ায়।'

আবূ মাহমূদ যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলল, 'আর যদি আজ রাতেই আসে?'

হাবীব দৃঢ়ভাবে বলল, 'সে আসবেই না।'

আবূ মাহমূদ তাকে রাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল। সে আবার দস্তরখানায় আঙুল দিয়ে আঘাত করে বলল, 'যদি আসে?'

'আসবে না।'

হাস্‌সান কিছু বলল না। সাঈদ ইবনু মানসূর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমরা অপেক্ষা করি।'

হাবীব উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ইয়াসার কখনও তোমাদের ফাঁদে পা দিবে না। তোমরা তাকে চেনো না। সে রমযান ছাড়াও সপ্তাহে দুই দিন সাওম পালন করে। প্রত্যেক রাতে কিয়াম করে। সে এই দুনিয়ায় মানুষের মাঝেই বাস করে। কিন্তু তার অন্তর, তার আত্মা বিচরণ করে ওই সুদূর আসমানে। ইয়াসারের মতো কে আছে?'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাতির দিকে তাকিয়ে নিজেকেই যেন বলল, 'এ দুনিয়ায় ইয়াসারের মতো কেই-বা আছে?'

আবূ মাহমূদ বেশ তাচ্ছিল্যের সাথে হেসে বলল, 'হাবীব! তুমিও এমনটাই ছিলে।'

হাবীব নীচু স্বরে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বলল, 'না, কক্ষনো না। আমি ইয়াসারের

মতো ছিলাম না। ইয়াসারের অর্ধেকও না। তারপরও তুমিই আমার এই অধঃপতনের কারণ। সব দোষ তোমার।'

আবূ মাহমূদ রেগে যেয়ে বলল, 'ভাই আমার! যাও তুমি। তুমি তোমার সালাত, ইবাদাত ও দুনিয়াবিমুখ অবস্থায় ফিরে যাও।'

হাস্‌সানও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কারণ তার স্ত্রীর নাম ছিল যুহদ। সে হাকীমের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আহ্, তুমি আমাকে আমার স্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। আমার অন্তরটা বিগলিত হয়ে গেল।'

তারপর মাথা নিচু করে সে নিম্ন স্বরে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সাঈদ হাস্‌সানের দিকে তাকিয়ে তার এ করুণ অবস্থা দেখে কষ্ট পেল। হাবীব নিজের সাথেই যেন কথা বলে চলল, 'আবূ মাহমূদ! তুমি যেমনটা বলেছ আমি তেমনটা না। যা-কিছু হলো সব তোমার কারণেই হলো। তুমি জানো যে, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যেতে পারব না। কারণ, তোমাদের সাথে থেকে আমিও কলুষিত হয়ে গেছি।'

আবূ মাহমূদ হাবীবের অবস্থা দেখে হেসে ফেলল। সে বলল, 'কেন? আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

হাবীব হতাশ গলায় বলল, 'আমি তো বললাম যে আমি পারব না...।'

হাবীবের কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় আওয়াজ পাওয়া গেল মৃদু কড়া নাড়ার। হাকীমের মুখে হাসি ফুটল। সে বেশ হেলেদুলে হাবীবের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তোমার বন্ধু এসে গেছে।'

হাকীম রুম থেকে বেরিয়ে গেল। হাবীব বিশ্বাস করতে পারল না। সে চেয়ে রইল দরজার দিকে। সাঈদের মুখে মুচকি হাসি। সবাই আগন্তুকের অপেক্ষায় দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। আবূ মাহমূদ তার পেছনে পবিত্র সুঘ্রাণধারী শ্মশ্রুমণ্ডিত এক যুবককে নিয়ে এল। সানন্দে বলল, তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, আমার নতুন অতিথি ইয়াসারকে।

হাবীব চিৎকার করে উঠল বিস্ময়ে। তার দু-চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সাঈদ উঠে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানা। হাস্‌সান জায়গায় বসে রইল। তার মুখে এক বিষণ্ণ মুচকি হাসি।

ইয়াসার লজ্জিত হয়ে প্রবেশ করল। তার মাথা নিচু। সে উপস্থিত কারও দিকে ফিরে তাকাল না। কোনো নড়াচড়া না করে বসে পড়ল। হাকীম কথাবার্তা চালিয়ে

গেল। বিভিন্ন হাস্যরসাত্মক কৌতুক পরিবেশন করতে লাগল। সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। হাবীব শুধু বিস্ময়ের কারণে কিছুই বলতে পারল না। আর ইয়াসারও কিছু বলল না। তার মুখে একটা মুচকি হাসির রেখা শুধু শোভা পাচ্ছিল। ইয়াসার হাবীবের উপস্থিতি টের পায়নি। আবূ মাহমূদ বিজয়ের উচ্ছ্বাসে যেন নাচছিল। আনন্দের ছটা তাকে ঘিরে রেখেছিল।

সে ইয়াসারের দিকে ঝুঁকে তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল।

ইয়াসার নিচুস্বরে বলল, 'আমি খুব খারাপ অবস্থায় আছি।'

আবূ মাহমূদ বলল, 'প্রেমে পড়েছ তুমি ভাই।'

ইয়াসার মাথা নিচু করে রইল। তার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে আছে। এরপর হাকীমের কানে কানে বলল, 'তাকে দীর্ঘ সময় দেখিনি।'

আবূ মাহমূদ উঠে গেল। যাওয়ার সময় বলল, 'আজকেই তাকে দেখবে। সে আসবে।'

হাবীব আর ধৈর্য ধরতে পারল না। চিৎকার করে বলল, 'অসম্ভব! এটা হতে পারে না।'

ইয়াসার এবার তার দিকে তাকাল। লজ্জায় যেন সে মাটির সাথে মিশে গেল। হাবীব তিরস্কার করছে! তাও কাকে? ইয়াসারকে! যেই ইয়াসার সব সময় হাবীবকে বলত গুনাহ্‌র কাজ থেকে বেঁচে থাকতে। তাকে সালাফদের ঘটনা বর্ণনা করে উপদেশ দিত। হাবীব তখন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে কাঁদত। আজ সেখানে হাবীবই তাকে তিরস্কার করছে। যেই জায়গার ব্যাপারে হাবীবকে ইয়াসার সতর্ক করেছিল, আজ সেখানেই ইয়াসার!

হাবীব আবার চিৎকার করে উঠল, 'ইয়াসার! তুমি এখানে এলে কেন?'

আবূ মাহমূদ ধমকের সাথে তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তুমি এলে কেন?'

ইয়াসার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাকীমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল। যথাসময়ে তাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু হাবীব থামল না। আবার চিৎকার করে বলল, 'ইয়াসার! এটা তোমার জায়গা না। তোমার জন্য এটা মানায় না। এই গর্তে তুমি পড়বে না।'

আরেকটু হলে হাকীম আর সাঈদ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এ সময় দরজায় টোকা শোনা গেল। সবাই চুপ হয়ে গেল। কেউ নড়ল না। সবাই হাকীমের দিকে তাকাল। হাকীম মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'জানি না কে হতে পারে।'

ঘরের ভেতরে সারশীর ছিল। সে দরজা খোলার জন্য ছুটে গেল। আগন্তুককে দেখে খুশিতে চিৎকার করে বলল, 'মুরীদ, তুমি ফিরে এসেছ।'

তার জন্য জায়গা করে দিয়ে আরও বলল, 'আমার মন বলছিল তুমি আসবে। ঢুকে পড়ো।'

নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য থেমে এবার বলল, 'তোমার মতো লোক আমানতের খেয়ানত করতেই পারে না। তোমার ওপর আমার বাবা এ জন্যই নির্ভর করতেন।'

মুরীদ জায়গা থেকে এক পা-ও না নড়ে বলল, 'আমি আপনাকে ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিতে এসেছি।'

তার দিকে বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে রইল মেয়েটি। সে বলে চলল, 'কাফেলায় ভারতের এক পরিব্রাজকের সাথে দেখা। তিনি জানালেন...'

দ্রুত জিজ্ঞাসা করল সারশীর, 'কী জানালেন?'

'জানালেন যে সুলতান আব্দুল হালীম একটা বড়সড় সৈন্যদল প্রস্তুত করে মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে পেরেছেন; যে সৈন্যবাহিনী সেই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীকে সাহায্য করেছিল। তারা সুলতান মাহমূদকে মিন্দানাওয়ের দায়িত্বে ফিরিয়ে এনেছে।'

'তুমি কি নিশ্চিত সে সত্য বলেছে?'—প্রচণ্ড খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল সারশীর।

'অবশ্যই। সে নিজ চোখে সব কিছু দেখেছে। সে আরও জানিয়েছে যে, যারাই সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তারা সবাই আবার মিন্দানাওয়ে ফিরে গেছে এবং নিজ নিজ রাজত্বে ফিরে এসেছে।'

আনন্দে সে ফেটে পড়ল। ইচ্ছা হলো মুরীদকে ধরে ভেতরে নিয়ে আসবে। তার কাছে সবকিছু খুলে বলবে। পরক্ষণেই মনে হলো যে, মুরীদ যদি এই লোকগুলোকে আবার তার ঘরে দেখে তা হলে এমন রেগে যাবে যে তাকে রেখে চলেই যাবে, আর ফিরে আসবে না।

তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন যাব তা হলে?'

'আগামীকাল সকালে ইন শা আল্লাহ। প্রথমে একটা নৌকায় বাগদাদ থেকে বসরায় যাব। সেখান থেকে একটা জাহাজে করে রওনা দেবো ভারতের উদ্দেশ্যে।'

সারশীরের মনটা আনন্দে ভরে গেল। সে বুকভরে শ্বাস নিয়ে বলল, আল্লাহ!

আমি কতদিন ধরে এই সমুদ্র দেখতে চাচ্ছি। সমুদ্রের ঘ্রাণ নিয়ে বুকটা ভরতে চাচ্ছি। মুরীদ যেতে উদ্যত হয়ে বলল, আগামীকাল সকালে সূর্যোদয়ের পর আপনার কাছে আসব। আপনি দেরি করবেন না।

'যেমনটা তুমি চাও। আজ রাতে কোথায় থাকবে?'

প্রশান্তিময় গলায় মুরীদ বলল, 'মাসজিদে।'

কিছুক্ষণের জন্য চুপ থেকে বলল, 'ব্যক্তির আত্মা ও হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য ওটাই তো সর্বোত্তম স্থান।'

মুরীদ তাকে বিদায় জানানোর সময় বলল, 'অবশ্যই আগামীকাল সকালে প্রস্তুত থাকবেন।'

সে হাত নেড়ে বলল, 'আমি অপেক্ষায় থাকব তোমার।'

দরজাটা টেনে দেওয়ার আগে আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাল সারশীর। দেখতে পেল, এক ঝাঁক পাখি নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। ঘরে ফিরে যাওয়ার আকুতিতে গান গেয়ে যাচ্ছে আপন মনে। যেন রাত ঘনিয়ে আসার আগেই পৌঁছতে পারে আপন নীড়ে।

বিষণ্ণতার চাদর তাকে ঘিরে ফেলল। সে ফিরে যাবে ভারতে।

কিন্তু একাই থাকবে। তার বাবাও নেই। মাও নেই।

মুরীদও নেই। হয়তো দায়িত্ব পালনের জন্য তার কাছে এসে শুধু খোঁজখবর নিবে। তারপর তাকে ছেড়ে কোনো এক ঘরে ঢুকে দুনিয়াবিমুখদের মতো ইবাদাতে মজে যাবে। তাকে দেখলে মনে হয় দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়েছে। তার অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলেছে দুনিয়াকে। দুনিয়ার দিকে সে ফিরে আসে না। দুনিয়া সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেও সে তার দিকে ফিরে আসতে দেয় না দুনিয়াকে।

কথিত আছে, এ সমুদ্র দজলা নদীর থেকে বহুগুণে প্রসারিত। জীবনে যত নদী সে দেখেছে তার থেকে এ সমুদ্র অনেক অনেক প্রশস্ত। আসলেই কি সে সমুদ্রে যাবে, যে পথে সিন্দাবাদ তার সাতটা ভ্রমণে গিয়েছিল। এ নৌকা কি এমন কোনো দ্বীপে গিয়ে থামবে যা আসলে মাছের পিঠ! হয়তো সে সিন্দাবাদের গল্পে যত আজব ঘটনা পড়েছে তার থেকেও অবাক করা কিছু দেখবে!

আর মুরীদ, গভীর রাতের মতো কালো লোকটা। তার ভেতরে যে দিনের আলোর থেকেও পরিষ্কার একটা অন্তর রয়েছে। তার এ অন্তরটা এতই স্বচ্ছ ও একনিষ্ঠ যার

কোনো নজির নেই।

দরজাটা বন্ধ করে সে সাজগোজ করে নিল। তারপর আগন্তুকদের সাথে রাত কাটানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করল।

শাইখের উপদেশ

মেয়েটা গোলাপি রঙের এক নতুন পোশাক পরে ছিল। তার শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল আতরের খুশবু। তার সৌন্দর্য যেন পরিপূর্ণ ছিল। তারপরও তাকে মনে হচ্ছিলো বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখিত।

সে উপস্থিত সবার দিকে তাকাল। ইয়াসারের দিকে চোখ পড়তেই স্তব্ধ হয়ে গেল সে। নিজ জায়গায় পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল। এতই বিস্মিত হলো যে, আর নড়তেও পারল না। ইয়াসারের আগমন তার কাছে খুবই বিস্ময়কর ছিল। সে হাকীমের দিকে তাকাল। হাকীম হেসে বলল, 'আরে এ তো ইয়াসার। চেনো না তাকে?'

সে এগিয়ে আসল ধীরে ধীরে। ইয়াসারকে সালাম দিলো। তার দিকে ঝুঁকে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। তবে এতে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের মিশ্রণ ছিল। তার পাশে বসল।

হাবীব আর সহ্য করতে পারল না। মজলিস ছেড়ে উঠে গেল। রাগে-দুঃখে জ্বলতে লাগল তার ভেতরটা। ইয়াসারের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেয়ে হাকীম বলল, চিন্তা কোরো না ইয়াসার। সে আবার আসবে। তারপর মদ পান করে নিজেকেও ভুলে যাবে।

ইয়াসার মনে মনে চাচ্ছিলেন যেন হাবীব না আসে। কারণ হাবীব এলে তার কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগে। হাকীম একটা গ্লাস তুলে ইয়াসারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও। পান করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো ইয়াসার। সারশীরের দুই চোখের দিকে তাকাল।

তার কাছ থেকে যেন সাহায্য চাইতে লাগল। কিন্তু মেয়েটা এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাল না। তাই ইয়াসারও হাত দিয়ে ইশারা করে না করে দিলেন। ইয়াসার তার দিকে ফিরে বলল, 'আমি মদ পান করি না।'

আবূ মাহমূদ হাসতে হাসতে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আরে পান করো ইয়াসার। পান করো। তোমার লজ্জাটা দূর হয়ে যাবে। সব দুশ্চিন্তা উবে যাবে। ভুলে যাবে দুনিয়াটাই। সময়টা তুমি উপভোগ করতে পারবে।'

ইয়াসার কিছুটা ইতস্তত বোধ করল। আবার বলল, 'না, আমি পান করব না।'

তার কাছে মনে হলো যেন দুনিয়াটা তার চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার মনে পড়ল আবুল হুসাইনের কথা। আবুল হুসাইন তার অবস্থা শুনে বলেছিলেন, 'তাকে ছেড়ে দাও। তার মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকে, তা হলে আল্লাহ তাকে তোমাদের সাথি করে দিবেন। আর যদি তার মধ্যে খারাপ কিছু থাকে তা হলে তো আল্লাহই তোমাদেরকে তার থেকে মুক্তি দিলেন।

আবূ আনাসের কথা তার কানে ভেসে এল—আল্লাহর কসম! আমি মনে করেছিলাম তার আসলটা আরও মজবুত।

ইয়াসার তাকিয়ে দেখল। তার সামনে একজন তাকে মদের গ্লাস হাতে তুলে দিচ্ছে আর পান করতে প্ররোচিত করছে—আরে ইয়াসার। পান করেই দেখ না। এই নাও।

তার সামনে ভেসে আসল তার দুখিনী মায়ের চেহারাটা। তার মা তার দিকে তাকিয়ে আছেন অসহায় চোখে। কিন্তু কিছু করতে পারছেন না। ছোটো বোন সানা বিড়ালটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে আছে মমতার দৃষ্টিতে।

হাকীম এবার বেশ জোর দিয়েই বলল, 'ইয়াসার! কোথায় গেলে? এই নাও।'

গ্লাসটা কাছে নিয়ে এল। ইয়াসার গ্লাসটা হাতে নিল। হাতেই গ্লাসটা রইল। এবার আবূ মাহমূদ ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। সে তার উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। আনন্দের আতিশয্যে সে চিৎকার করে বলল, 'হাবীবকে নিয়ে আসো। সে কোথায়? তাকে বলেছিলাম না, আমি নিজ হাতে তাকে মদ পান করাব?'

ইয়াসার হাকীমের কথাগুলো বুঝতে পারেনি। সে ঘুরপাক খেতে লাগল ভাবনার মাঝে। তার সামনে ভাসতে লাগল সেই যুবক বন্ধুদের চেহারাগুলো; যাদের সাথে সে মাসজিদে শাইখের দরসে দিনকাল কাটিয়েছে।

তার সামনে ভাসতে লাগল সেই দৃশ্যগুলো।

আবুয যাহাব তার হাত কামড়াচ্ছে। আবুল হুসাইনের কথা, আলি ইবনুল হুসাইনের কথাও তার মনে পড়ল। গোল মুখ, ছোটো চুল, স্বভাবজাত গাম্ভীর্য, মুচকি হাসির সমাহার এই আবুল হুসাইন। সে যেন বলছে, সে তো বেশি দূরে যায়নি। যতই দূরে যাক সে ফিরে আসবেই।

আবূ মাহমূদ এদিকে বিজয়ীর মতো বলতে লাগল, 'আমি তোমাকে এখানে নিয়ে আসা বিনিময়ে এক হাজার দীনার দিয়েছি এই মেয়েকে। আমি কসম করেছি যে তোমাকে নিজ হাতে মদ পান করাব। ইয়াসার, পান করো ভাই। পান করো। হাবীব কই?'

ইয়াসার সারশীরের দিকে তাকাল। সে কি সত্যি বলছে? তার কথা ইয়াসারের বিশ্বাসই হচ্ছে না। তাকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে এক হা-জা-র দীনার! তাকে শয়তানের মুখের ভেতরে ফেলার বিনিময়ে!

এবার ইয়াসার আবার সারশীরের দিকে তাকাল। তার তাকানোর ভঙ্গিতে সারশীর ভয় পেয়ে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে সে নেতিবাচক সাড়া দিয়ে বলল, 'তাকে বিশ্বাস করবেন না ইয়াসার। তাকে বিশ্বাস করবেন না। সে...'

সাঈদ তার সামনে নিজের গ্লাসটা রাখল। দুই হাত দস্তরখানায় বিছিয়ে দিয়ে মজা উপভোগ করতে লাগল। হাস্‌সান যথাস্থানে চুপ করে বসে আছে। সে নিজের ভাবনায় ডুবে আছে। আর একটু পর পর বলছে, 'যুহদের কথা মনে পড়ায় আমার হৃদয়টা কেঁপে উঠেছে।'

ইয়াসারের তখন মনে পড়ল। আবূ আনাস আজকে আসরের পর বড় বাজারে তার সাথে দেখা করে শাইখের পক্ষ থেকে একটা চিরকুট দিয়েছিল। ডান হাত থেকে বাম হাতে গ্লাসটা নিয়ে নিল ইয়াসার। তারপর সেটা দস্তরখানায় রেখে দিলো। হাত বাড়িয়ে পকেটে চিরকুটটা খুঁজতে লাগল। অবশেষে খুঁজেও পেল। সেটা খুলে পড়তে লাগল :

"আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। শয়তান তোমার কাছে বিভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকবে। তবে প্রধানত নারীর মাধ্যমে ঢুকবে। তুমি তার থেকে দায়েমি যিকর, দৃষ্টি সংযত করা ও কুরআন তিলাওয়াত করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

নিজেকে মনে করিয়ে দাও, এই সুন্দরী মেয়ের চেহারা কিছুদিন পর একটা মৃতদেহে পরিণত হবে; যে দেহ কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলবে। আর জান্নাতে এমন হূরে ঈন আছে যাদেরকে উদীয়মান সূর্য দেখলেও লজ্জা পায়।"

চিরকুটটা শাইখের নিজ হাতে লেখা ছিল।

তা হলে তার ধারণা ভুল!

শাইখ তাকে ভুলে যাননি। তাকে বর্জনও করেননি।

এই যে, তিনি আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

তাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

আবূ মাহমূদ হেসেই চলেছে। তাকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে মদ পান করতে।

মেয়েটা ইয়াসারের মুখের মধ্যে পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ করল। নিজেকে আস্তে করে সরিয়ে নিল। হাস্‌সানের পাশে গিয়ে বসল। সাঈদ তাকিয়ে রইল বাতিগুলোর দিকে; যা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

আবূ মাহমূদ তাকে প্ররোচনা দিয়েই যাচ্ছে, আরে পান করেই ফেলো না। তোমাকে এটা পান করাই লাগবে। আমিই তো তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। তুমি যেই ইবাদাতে মশগুল ছিলে তার থেকে বের করে এনেছি। তোমাকে মাসজিদ থেকে বের করে এনেছি। তুমি মজাটা উপভোগ করে নাও। দুনিয়া ভুলে যাও। কালকেই তো আমরা মারা যাব। দুনিয়ায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আসবে।

হাকীমের কথাগুলো তার মাঝে ঈমান আরও জাগিয়ে তুলল।

আগামীকালই তো আমরা মারা যাচ্ছি। আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য দাঁড়াব। তিনি সবকিছুর হিসাব নিবেন। প্রতিটি পদক্ষেপের। প্রতিটি কথার। প্রতিটা গুনাহর। তখন অনেকে চিৎকার করে বলবে— "হায়! আমাদেরকে যদি ফিরিয়ে দেওয়া হতো, তা হলে আমরা আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলতাম না।"

ইয়াসার মাথা নিচু করল। চেয়ে রইল চিরকুটটার দিকে। তার মনে হলো যেন শাইখের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে সে। শাইখ তাকে ভয় দেখাচ্ছেন। সতর্ক করছেন। তার কানে আওয়াজ ভেসে এল, "আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। শয়তান তোমার কাছে বিভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকবে। তবে প্রধানত নারীর মাধ্যমে ঢুকবে। তুমি তার থেকে দায়েমি যিকরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও...'

ইয়াসারের যে হাতে গ্লাস ধরা সেটা এবার খপ করে ধরে ফেলল আবূ মাহমূদ। সেটা মুখের দিকে তুলে দিয়ে বলল, 'পান করে ফেলো ইয়াসার।'

হাবীব এ সময় ফিরে এল। সে প্রবেশ করে জায়গায় দাড়িয়েই বলল, 'ইয়াসার!

পান করবে না।'

আবূ মাহমূদ হাবীবকে দেখে বেশ খুশি হলো। এবার তাকে দেখানোর চেষ্টা করল যে সে কীভাবে ইয়াসারকে মদ পান করাবে। সে ইয়াসারের ওপর জোর-জবরদস্তি করতে লাগল। তার হাত ধরে গ্লাসটা মুখের দিকে টেনে নিতে লাগল। তার খুবই আনন্দ হচ্ছে। ওদিকে এ কাজের জন্য হাকীম নিজেকে প্রশংসার দাবিদার মনে করছে।

হাবীবকে ডেকে বলল, 'এই দেখ। আমি নিজ হাতে তাকে মদ পান করাচ্ছি। তোমাকে বলেছি না?'

ইয়াসারের পক্ষে আর ধৈর্যধারণ করা সম্ভব হলো না। সে রাগে ফেটে পড়ল। দাঁড়িয়ে গেল বিক্ষুব্ধ হয়ে। গ্লাসটা ছুঁড়ে মারল হাকীমের মুখে। পা দিয়ে লাথি মারল দস্তরখানায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল সব খাবার। হাকীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মারা শুরু করল ইয়াসার। হাকীমের সামনে দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল।

মেয়েটা দৌঁড়ে পালাল। তার পাশেই ভাঙা গ্লাসের এক টুকরো ছিল। সেটা পায়ে লেগে পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। ইয়াসারের সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারল না। ইয়াসার সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। একবারেই।

তার অন্তরের মধ্যে জমে থাকে মরীচিকার আস্তরণ জমা করে গোলক বানিয়ে যেন একটা একটা ঘুষিতে ছুড়ে দিচ্ছে হাকীমের মুখে। হাবীব যারপরনাই খুশি হলো। হাস্‌সানের কাছে দৃশ্যটা বেশ চমৎকার লাগল। তাই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুচকি হাসতে লাগল। ওদিকে সাঈদ বৃথাই চেষ্টা করছিল ইয়াসারের রাগ কমানোর। ইয়াসার বেরিয়ে গেল।

তার কানে তখনও শাইখের কথাগুলো বাজছে : "এই সুন্দরী মেয়ের চেহারা কিছুদিন পর একটা মৃতদেহে পরিণত হবে; যে দেহ কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলবে। আর জান্নাতে এমন হূরে ঈন আছে যাদেরকে উদীয়মান সূর্য দেখলেও লজ্জা পায়।"

ইয়াসারকে বিদায় জানাতে খেজুর গাছটা নড়ে উঠল। বাতিগুলোতে এক নতুন রঙ জ্বলে উঠল। ইয়াসারের মনে হলো সবগুলো বাড়ি, দেয়াল—সমগ্র দুনিয়া তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। যেন বলছে, 'তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?'

মাসজিদের দিকে রওনা হল ইয়াসার।

শাইখের সাথে দেখা করতে হবে।

শাইখের সামনে বসে নিজের ভুলগুলো জানান দিবে সে।

রাস্তাটা দীর্ঘ। পথে অনেকগুলো মোড়। দুই পাশেই সারি সারি বাড়ি।

কিন্তু তাদের কোনো আওয়াজ ইয়াসারের কানে আসছে না। যে ভিখারি হাত বাড়িয়ে সাহায্য চাইল তার আওয়াজও কানে আসল না। তাকে এখন মাসজিদে যেতেই হবে। আগের অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাওবা করে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে চলে আসতে হবে আল্লাহর কাছে।

সে ভাবতেই পারেনি যে সে তার কোনো সাথিকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে! সে কখনও ভাবেনি যে তাদের থেকে এত দূরে চলে যাবে। কীভাবে এত দূরে চলে গেল? সে তো এক ভয়াবহ রাস্তায় চলেছে। যে এ রাস্তা দিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারে সেই তো আসল সৌভাগ্যবান।

মাসজিদে যাওয়ার অভ্যাস ইয়াসারের ছোটোবেলা থেকেই। শৈশবকালের শুরু থেকেই শাইখের আলোচনা শোনার অভ্যাস। আবুয যাহাব প্রতিদিন দরজায় নক করত। তাকে উঠিয়ে দিত সালাতের জন্য। তারপর তাকে হাত ধরে নিয়ে যেত মাসজিদে। তাকে অনেক আদর করত; যেভাবে বড় ভাই ছোটো ভাইকে স্নেহ-মমতা দিয়ে বড় করে।

তার মনে পড়ে ওই দিনগুলির কথা।

দিনগুলো কত আনন্দের ও প্রশান্তির ছিল!

আর আবুদ। লম্বা শ্যামলা ছেলেটা। যে ছেলেটা কয়েক বছর ধরে নিজের উপযুক্ত মেয়ে খুঁজে হয়রান। কিন্তু খুঁজে পায়নি। কারণ তার উপযুক্ত কোনো মেয়েই নাই। অথবা তার মায়ের মতো ভালো কোনো মেয়ে সে পায়নি—যেমনটা তার ভাই বলে থাকে।

শাইখ ইবরাহীমের ছেলে আবদুল্লাহ। ভদ্র ও পবিত্র ছেলেটা। কী বিনয়ী আর নম্র! যে ডাক্তারি পড়তে চলে গেছে। যাকে মসজিদের আঙিনায় বারবার দেখা যেত। সে সূরা তাওবা মুখস্থ করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আর আবূ আনাস। তার কথা বলে শেষ করা যাবে না। সে খুবই খোলামনের হাসিখুশি মানুষ। সে কল্পনার জগতেই কত প্রকল্প হাতে নেয়। তার মায়ের ঘটনা বলে চলে; কীভাবে তার মা হিসাব করতে ভুল করে।

আবুল হাসান আলি ইবনু হুসাইন। ভদ্র আর শান্ত স্বভাবের। 'মাদরাসা মুস্তানসিরিয়্যা' থেকে যে ফিকহি দরসগুলো শিখেছিল সেগুলোর কথাও মনে পড়ে।

তার বন্ধু জসীম। যে সব সময় আলির সাথেই থাকে। জসীমের সাথে এক যুবকের ঘটনাটাও মনে পড়ে। একবার ওই যুবক তার সালাত নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছিল। পরে সে স্বপ্নে দেখল যে, এক লোক তাকে চাবুকাঘাত করছে। ঘুম ভেঙে আবিষ্কার করল তার পিঠে চাবুকের দাগ!

আরও অনেকে। তারা সবাই ইয়াসারকে ঘিরে ছিল। তাকে ভালোবাসত। অনেকের কাছে ইয়াসার ছিল আদর্শ। তারা চাইত তার মতো হতে! কেউ কি ভালো জিনিসের বদলে খারাপটা নিতে চায়?

ইয়াসার এশার জামাআত শেষ হওয়ার আগেই মসজিদে পৌঁছনোর জন্য ছুটে চলল। রাতের বেলা শাইখের বাড়িতে বিরক্ত করা যাবে না। ইয়াসার রাতে তার বাড়িতে গিয়েও অভ্যস্ত না।

মনে হলো যদি উড়ে যাওয়া যেত। যতদ্রুত সম্ভব পৌঁছতে যে হবেই। ওসমান চাচার কথা মনে পড়ল। তার বয়স একশত বছর পেরিয়ে গেছে। তিনি একদিন তাকে বলছিলেন, 'ইয়াসার! তুমি যেরকম আল্লাহর ইবাদাত করে বেড়ে উঠেছ তেমনি যদি আমিও বেড়ে উঠতাম। তোমার জীবনটাই ধন্য!'

তারপর রুমাল দিয়ে চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রুর ধারা মুছে বলেছিলেন, 'হায়, আমার জীবনটা দীর্ঘ কিন্তু আমল স্বল্প।'

ইয়াসার কক্ষনো এগুলো ভুলবে না। তার বাবার কথাও ভুলবে না যিনি ফাজরের সালাতের পর দুআ করতেন, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যিনি আমাকে এতো ভালো ছেলে দিয়েছেন; যার দুআ আমার কবরে পৌঁছাবে।

ইয়াসারের মনে পড়ে মায়ের কথা। যিনি কয়েকদিন আগে তার দিকে তাকিয়ে নীরবে কাঁদছিলেন আর ইয়াসারের বাবাকে বলছিলেন, 'ইয়াসারের কী হয়েছে আমি বুঝছি না! তার সাথে কথা বলে দেখুন। হয়তো আপনাকে সে খুলে বলবে।'

ছোটো বোন সানা। এখন আর ইয়াসার তার সাথে মজা করে না। তার বিড়াল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করে না। এমনকি সানা মায়ের কাছে অভিযোগ দিয়ে বসল, 'ইয়াসার ভাইয়ার কী হয়েছে? উনি কি অসুস্থ নাকি?'

আর শাইখ। যে শাইখকে তার কতই-না ভালো লাগত! শাইখের কথা শুনতে ইয়াসারের একটুও বিরক্তি লাগত না। তিনি তাগাদা দিতেন আরও বেশি আমল করার। শাইখের কাছে উপকারী বিষয় ছাড়া আর কিছুই তো ছিল না। তিনি যে কথা বলতেন, মনে হতো যেন তিনি এক বিশাল অকূল সমুদ্র থেকে জল তুলে আনার

চেষ্টা করে চলেছেন।

ইয়াসার এখন সেই শাইখের দিকেই যাচ্ছে। তার কাছে সব ঘটনা খুলে বলবে সে।

তাকে বলবে। কিন্তু কী বলবে? কীভাবে বলবে?

সামনেই মাসজিদে। প্রাচীন কাঠামো। দেয়ালগুলো দেখলে মনে হয় এখনি ভেঙে পড়বে। পুরাতন মিনার।

ধীর পদক্ষেপে ইতস্তত করতে করতে এগিয়ে গেল ইয়াসার। মাসজিদের দেয়ালের পাথরগুলো যেন তার দিকে নিন্দাচ্ছলে চেয়ে আছে। যেন বলছে—কোথায় ছিলে তুমি? এতদিন পর আসার সময় হলো?

তবু যেন দেয়ালগুলো তার আগমনে খুশি। এই মাসজিদ যে তাকে চিনে। এ মসজিদের প্রতিটি পাথর তাকে চিনে।

কোনো মানুষ আসার আগে কতবার যে সে এ মাসজিদে একাই এসেছে।

কত দীর্ঘ সময় এ মাসজিদ-প্রাঙ্গণে সে কাটিয়েছে। সালাত আদায় করেছে। কুরআন তিলাওয়াত করেছে কিংবা আল্লাহর স্মরণে দিনগুলো কাটিয়ে দিয়েছে। জামাআতে সালাতের প্রথম কাতারে সে থাকত। প্রথম তাকবীরের সাথেই।

মাসজিদের দরজা বেয়ে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করল। মুখে বলল,

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"আল্লাহ্ গো! তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও আমার জন্যে।" (আদ দুআ লিত তবারানি : ৩৯০)

আল্লাহর রহমতের দুয়ারগুলো সব সময় যে খোলা। দিনে-রাতে কখনও সেগুলো বন্ধ হয় না।

কোথায় তারা, যারা তাওবা করতে চায়? যারা ফিরে আসতে চায়? যারা পাপ কাজ করে অনুশোচনায় দগ্ধ? আসমান ও জমীনের রব তো রয়েছেন তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য। তিনি তো বলেছেন, পাহাড়সম গুনাহ নিয়েও তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

মসজিদের আঙিনায় বড় গাছটা, আগের জায়গাতেই অটল। বাতিগুলোতে জ্বলছে। ওই তো অযু করার পানি। মসজিদের খাদেম হামীদ ইবনু সালূম আর-

রিকাকও আছেন।

ইয়াসার অগ্রসর হলো।

মুসল্লীরা ইতোমধ্যে বেরিয়ে গেছে। খাঁ খাঁ করছে মাসজিদ প্রাঙ্গণ। কিন্তু ইয়াসার হতাশ নয়। হয়তো শাইখ এশার সালাতের পর এখনও আছেন।

তার ধারণা সত্যি হলো।

শাইখ দাঁড়িয়েই ছিলেন। দেখে মনে হবে যেন ইয়সারের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। মাসজিদের মাঝেই এক পিলারে হেলান দিয়ে ইয়াসারের দিকে চেয়ে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে এক দয়াদ্র পিতার স্নেহময় দৃষ্টি।

ইয়াসার এগিয়ে গেল।

লজ্জিত হয়ে। দুনিয়ার সমস্ত গুনাহ্ যেন তার পিঠে।

তার কাছে গেল। সালাম দিলো ইয়াসার। মনে হলো শাইখ জবাব দিচ্ছেন। কাঁধের ওপর একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করলেন ইয়াসার। এক ভরাট আওয়াজে শাইখ কুরআনের বাণী তিলাওয়াত করলেন :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"বলো, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ— আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।" (সূরা যুমার : ৫৩)

আয়াতটা শুনে ইয়াসারের অন্তরটা কেঁপে উঠল। সে যেন প্রথমবারের মতো এ আয়াত শুনছে। ফেরেশতারা যেন আয়াতটা বহন করে আনছে আর মাসজিদে চিৎকার করে পাঠ করছে।

তার কাছে মনে হলো সবকিছুই—এমনকি বড় বাতিগুলো, খেজুর গাছটা, মসজিদের প্রতিটা ইট তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আনন্দ প্রকাশ করছে তার প্রত্যাবর্তনে। তার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে দুই হাত।

ইয়াসার কিছু একটা বলতে চাইল। শাইখের কাছে সবকিছু খুলে বলতে চাইল। কিন্তু পারল না। তার কথাগুলো রূপ নিল অশ্রুবিন্দুতে। আজ না হয় চোখের পানিগুলোই কথা বলুক। নিভিয়ে দিক জাহান্নামের আগুন।

শাইখের শান্ত আওয়াজ কুরআন থেকে তিলাওয়াত করতে লাগলেন। এ তিলাওয়াত ইয়াসারকে আশা দিলো, তাকে দয়া দিয়ে আচ্ছাদিত করল এবং তাকে আগ্রহী করে তুলল আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে। তার ভেতরে জাগিয়ে তুলল সেই আগের ইয়াসারকে। তিনি তিলাওয়াত করলেন :

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ

"আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি—যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। তারপর সৎপথে অবিচল থাকে।" (সূরা ত্ব হা : ৮২)

আবদুর রহমান দাঊদ ইবনু সুলাইমান উবাইদি।

পহেলা জুলাই ১৯৩১ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোটো ছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে তিনি বেশ কয়েক বছর কারাগারে কাটান। পরবর্তীকালে অনার্স শেষ করেন বাণিজ্য বিভাগ থেকে। তারপর সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করার পর যোগাযোগ বিভাগে চাকুরি করা শুরু করেন। অবসরের আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে রত ছিলেন। ১৯৯০ সালের ২৩ মার্চ জুমুআর দিন তিনি মারা যান। আবূ গারীব অঞ্চলে তাকে দাফন করা হয়।

কিছু মানুষ শুধু নিজে আলোকিত হন না, অপরকেও আলোকিত করেন। যার ঈমান ও আমল দেখে সবাই অনুপ্রাণিত হন, তার মতো হবার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু এমন তাকওয়াবান লোকেরও পদস্খলন ঘটতে পারে। শয়তান তাকে টেনে এমন নীচে নামাতে পারে যেটা সবাই তো বটেই, সে নিজেও কখনও কল্পনা করতে পারেনি। তারপর? তারপর কী হয়?

এরপর জীবনের গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে অশ্রুতে। কারও জন্য সে অশ্রু আক্ষেপের, কারও জন্য-বা সেটা অনুশোচনার। আমাদের গল্পের ইয়াসারের কেমন পরিণতি হয়েছিল? শয়তানের অব্যর্থ তিরে হৃদয়ের সাতটি দরজা খুলে যাবার পর যে নাজুক অবস্থায় সে উপনীত হয়েছিল, তা থেকে কি ইয়াসার ফিরে আসতে পেরেছিল?

শেষের অশ্রু শুধু বাগদাদের ইয়াসারের গল্প নয়। বরং, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য হোঁচট খাওয়া যুবকের গল্প। গল্পগুলো তো আমাদের-ই।